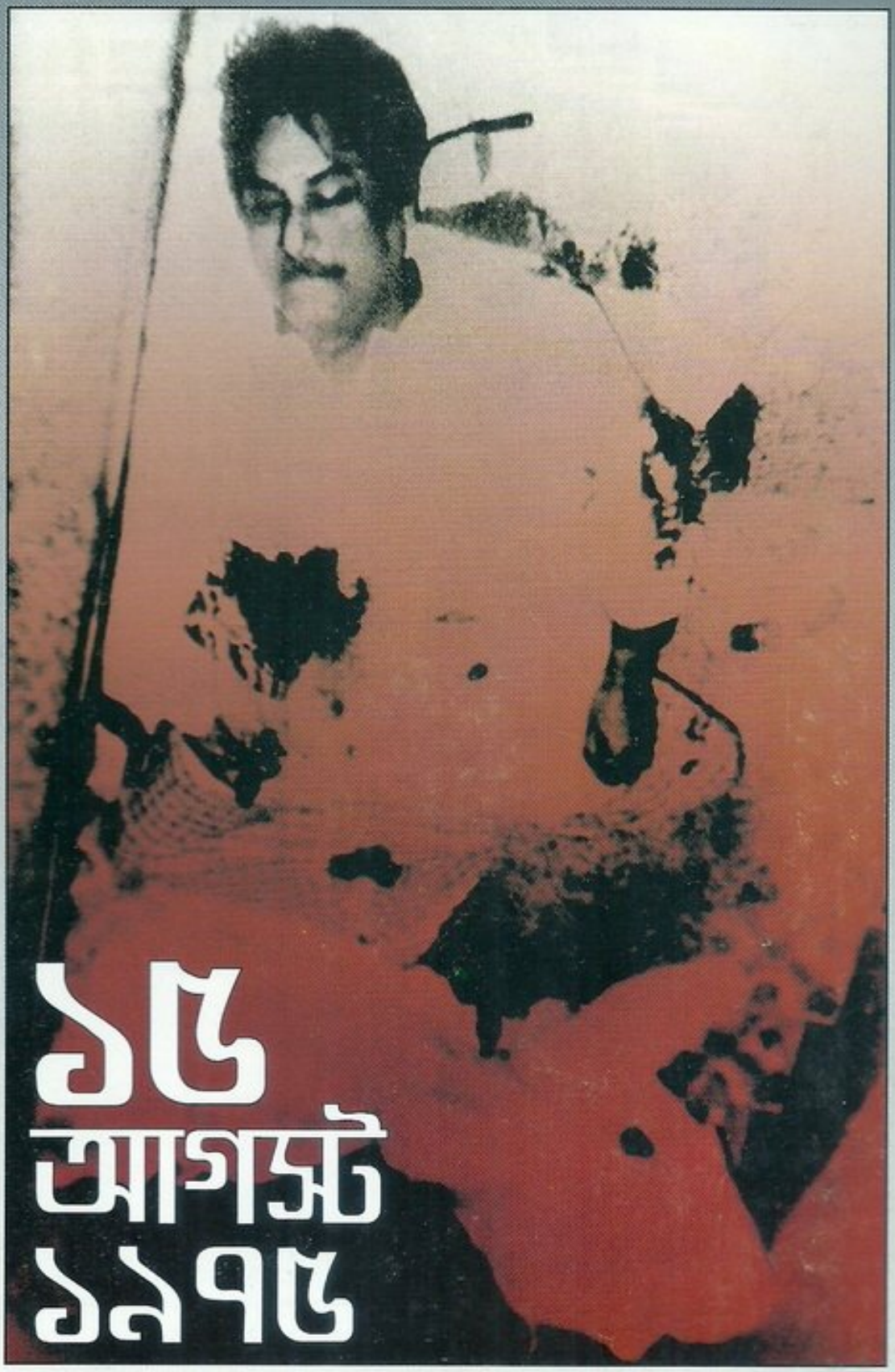
১৫
আগস্ট
১৯৭৫

বঙ্গবন্ধু ভবনের এই সিঁড়িতেই ঘাতকের দল বঙ্গবন্ধুকে বুলেটবিদ্ধ করে

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড

শেখ হাসিনা

আল-হু.....

হা ইয়া আলাস্ সালাহ্

.....

হা ইয়া আলাল ফালাহ

নামাজের দিকে এসো .....

কল্যাণের দিকে এসো .....

মসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসছে, প্রতিটি মুসলমানকে আহ্বান জানাচ্ছে–সে আহ্বান উপেক্ষা করে ঘাতকের দল এগিয়ে এলো ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটাবার জন্য।

গর্জে উঠলো হাতের অস্ত্র। ঘাতকের দল হত্যা করল স্বাধীনতার প্রাণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এই নরপিশাচরা হত্যা করল আমার মাতা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবকে। হত্যা করল মুক্তিযোদ্ধা ছাত্রনেতা শেখ কামালকে, শেখ জামালকে, তাদের নব পরিণীতা বধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামালকে। যাদের হাতের মেহেদীর রং বুকের তাজা রক্তে মিশে একাকার হয়ে গেল। খুনীরা হত্যা করল বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ভ্রাতা শেখ আবু নাসেরকে। সামরিক বাহিনীর বিগ্রেডিয়ার জামিল যিনি রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা দানের জন্য ছুটে এসেছিলেন। হত্যা করল কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার ও কর্মকর্তাদের।

আর সব শেষে হত্যা করল শেখ রাসেলকে যার বয়স মাত্র দশ বছর। বার বার রাসেল কাঁদছিল "মায়ের কাছে যাব" বলে। তাকে বাবা-ভাইয়ের লাশের পাশ কাটিয়ে মায়ের লাশের পাশে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল। ওদের ভাষায়, রাসেলকে Mercy Murder (দয়া করে হত্যা) করেছে।

ঐ ঘৃণ্য খুনীরা যে এখানেই হত্যাকা শেষ করেছে তা নয়, এই সাথে একই সময়ে হত্যা করেছে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু

মণিকে–হত্যা করেছে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাতকে, তাঁর তের বছরের কন্যা বেবীকে। রাসেলের খেলার সাথী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ১০ বছরের আরিফকে। জ্যেষ্ঠপুত্র আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ সন্তান চার বছরের সুকান্তকে। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সাংবাদিক শহীদ সেরনিয়ারবাত ও নাকুঁসহ পরিচারিকা ও আশ্রিত জনকে। আবারও একবার বাংলার মাটিতে রচিত হল বেঈমানীর ইতিহাস। ১৯৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে বাংলার শেষ নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে বেঈমানী করেছিল তাঁরই সেনাপতি। ক্ষমতা লোভ, নবাব হবার আশায়। ১৯৭৫ সালে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল বাংলাদেশে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল তারই মন্ত্রী পরিষদ সদস্য খন্দকার মোশতাক। রাষ্ট্রপতি হবার খায়েশে। ঘাতকের দলে ছিল কর্ণেল রশিদ, কর্ণেল ফারুক, মেজর ডালিম, হুদা, শাহরিয়ার, মহিউদ্দিন, খায়রুজ্জামান, মোসলেম গং। পলাশীর প্রান্তরে নীরবে দাঁড়িয়েছিল নবাবের সৈন্যরা সেনাপতির গোপন ইশারায়।

১৯৭৫-এর এদিনও নীরব ছিল তারা, যারা বঙ্গবন্ধুর একান্ত কাছের, যাদেরকে নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলেন, বিশ্বাস করে ক্ষমতা দিয়েছিলেন যাদের হাতে ক্ষমতা ছিল, তাদের এতটুকু সক্রিয়তা বা ইচ্ছা বাঁচাতে পারত বঙ্গবন্ধুকে, খন্দকার মোশতাকের গোপন ইশারায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল তারা, এগিয়ে এল মোশতাককে সাহায্য করতে। মীর জাফরের নবাবী কতদিন ছিল? তিন মাসও পুরো করতে পারে নাই-খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রপতি পদ (যা সংবিধানের সব নীতিমালা লংঘন করে হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অর্জিত) তিন মাসও পুরো করতে পারে নাই।

আসলে বেঈমানদের কেউই বিশ্বাস করে না। এমনকি যাদের প্ররোচনায় এরা ঘটনা ঘটায়, যাদের সুতোর টানে এরা নাচে তারাও শেষ অবধি বিশ্বাস করে না। ইতিহাস সেই শিক্ষাই দেয়। কিন্তু মানুষ কি ইতিহাস থেকে শিক্ষ নেয়? যুগে যুগে এ ধরনের বেঈমান জন্ম নেয়, যাদের ক্ষমতা লিপ্সা এক একটা জাতিকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়। ধ্বংস ডেকে আনে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবকে হত্যা করে বাংলার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকেই খুনীরা হত্যা করেছে। স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যকে হত্যা করেছে। বাঙালি জাতির চরম সর্বনাম করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের কোনো বিচার হয় নাই। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে খুনীদের আইনের শাসনের হাত থেকে রেহাই দিয়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করে পুরস্কৃত করেছে। আইনের শাসনকে আপন গতিতে চলতে দেয় নাই। বরং অন্যায় অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছে। লালিত করেছে। যার অশুভ ফল আজ দেশের প্রতিটি মানুষকে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগাচ্ছে।

এই খুনীদের বাংলার মানুষ ঘৃণা করে। বঙ্গবন্ধুকে এরা কেন হত্যা করেছে? কী অপরাধ ছিল তাঁর? স্বাধীনতা বড় প্রিয় একটি শব্দ। যা মানুষের মনের আকাঙ্ক্ষা। পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত থেকে দম ফেটে কে মরতে চায়?

একদিন পাকিস্তান কায়েমের জন্য সকলে লড়েছিল। লড়েছিলেন বঙ্গবন্ধুও। কিন্তু পাকিস্তান জন্মলাভের পর বাঙালি কী পেল? না রাজনৈতিক স্বাধীনতা না অর্থনৈতিক মুক্তি। বাঙালির ভাগ্যে কিছুই জুটলো না, জুটলো শোষণ, বঞ্চনা, নির্যাতন এবং মায়ের ভাষা মুখের ভাষাও পাকিস্তানি শাসকরা কেড়ে নিতে চাইলো। বুকের রক্ত দিয়ে বাঙালি তার মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করলো। বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেবার নানা ষড়যন্ত্র চলতে থাকলো। দেশের সম্পদ পাচার করে বাঙালিকে নিঃস্ব করে দিয়ে বাইশটি পরিবার সৃষ্টি করে শোষণ অব্যাহত রাখলো।

আর বঙ্গবন্ধু মুজিব শোনালেন অমর বাণী–স্বাধীনতা। দেখালেন মুক্তির পথ। "এবারের সংগ্রাম– আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম–আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা"–ঘোষণা করলেন বাঙালির বিজয়, সেই তো তাঁর অপরাধ।

যে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর লীলা ক্ষেত্র, জানোয়ারের মুখ থেকে শিকার কেড়ে নিলে যেমন সে হিংস্র হয়ে উঠে, তেমনি হিংস্র হয়ে উঠলো পরাজিত শত্রুরা। কারণ ঐ অমরবাণী ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে উঠল সমগ্র বাঙালির শিরায়-উপশিরায়। প্রচ রূপে আঘাত হানলো বাঙালির চেতনায়–১৯৭১-এর ৭ মার্চে বজ্রনিঘাত কণ্ঠের অমর সে বাণী যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করল প্রতিটি বাঙালিকে। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুকে পরাজিত করে বাংলার দামাল ছেলেরা ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতার লাল সূর্যকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ঐ পরাজিত শত্রুদের দোসর নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করলো যেন! পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করলো। মুজিববিহীন বাংলাদেশে আজ কী অবস্থা? বঙ্গবন্ধু মুজিবের সারা জীবনের সাধনা ছিল। শোষণহীন সমাজ গঠন। ধনী দরিদ্রের কোনো ব্যবধান থাকবে না। প্রতিটি মানুষ জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন আহার, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের সুযোগ পাবে।

সারাবিশ্বে বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তাকে সম্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে তিনি চেয়েছিলেন। আর সেই লক্ষ্যে সারা জীবন ত্যাগ-তিতিক্ষা করেছেন, আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন, জেল-জুলুম, অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেছেন। ফাঁসির দড়িও তাঁকে তাঁর লক্ষ্য থেকে একচুলও নড়াতে পারে নি। তাঁর এই আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য আদর্শস্থানীয়।

কিন্তু আমরা কী দেখি, বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেই ঘাতকরা ক্ষান্ত হয় নাই, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলেছে। বঙ্গবন্ধুর অবদান খাটো করা হচ্ছে। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে বির্জজন দেওয়া হলো। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেশ স্বাধীন করে যে গণতন্ত্র কায়েম করলো বাঙালিরা, সেই গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামরিক জান্তার শাসন কায়েম করলো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা।

সাধারণ মানুষ তার মৌলিক অধিকার হারালো। ভোট ও ভাতের অধিকার বন্দি হলো সেনা ছাউনিতে। এদের ছত্রছায়ার গড়ে উঠেছে ক্ষুদ্র লুটেরা গোষ্ঠী। অবাধ লুটপাটের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। এদের দুঃশাসনে প্রশ্রয় পেয়েছে দুর্নীতি ও চোরাচালনী। সামাজিক ন্যায়নীতি, মানবিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে শাসকগোষ্ঠী ভোগ বিলাস মাদকাসক্ত উচ্চ শ্রেণীর সৃষ্টি করে অবাধে শোষণ চালাচ্ছে। আর বৃহৎ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ এদেশের ৯০% মানুষ দরিদ্র, সীমার নিচে বাস করে। বঙ্গবন্ধুর আমলে যে শিক্ষিতের হার ছিল ২৬% তা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১৫%, ভূমিহীনের সংখ্যা ছিল ৩৭%, এখন প্রায় ৭০%। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের খাজনা দিতে হতো না, বর্তমানে খাজনাও ও করের বোঝা অতিরিক্ত। বিত্তবান ২২ পরিবারের পরিবর্তে জন্ম নিয়েছে কয়েক শত বিত্তবান পরিবার বাংলাদেশকে লুটপাটের অবাধ লীলাক্ষেত্রে পরিণত করেছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ ভাগ, এখন দাঁড়িয়েছে ২ ভাগেরও নীচে। আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশি পণ্যে দেশ ছেয়ে গেছে, দেশি পণ্য বাজারে বিকোচ্ছে না। অবাধ চোরাচালানীর কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে মদ, জুয়া, রেস ছিল নিষিদ্ধ, বর্তমানে ঘরে ঘরে মিনি বার বসেছে, বাজারে তো কথাই নেই। গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। মাদক চোরাচালানীর সুগম পথ আজ বাংলাদেশ। যার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া সমাজে অশুভ প্রভাব ফেলে কত না তাজা প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়েই চলেছে। আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির আজ চরম অবনতি ঘটেছে। বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবকেরা চাকরির অভাবে হতাশাগ্রস্ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্ত্রবাজিতে ধ্বংস করা হচ্ছে। সরকারি মদদে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করা হচ্ছে। বাজেটের সিংহভাগ চলে যায় অনুৎপাদনশীল খাতে, আর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যায় সব থেকে কম বরাদ্দ। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে জনজীবন দিশেহারা। অনাহার অপুষ্টিতে হাজার হাজার মানুষ ভুগছে। শিশুরা বিকলাঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। এইতো বাংলাদেশের চেহারা। স্বাধীনতার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে শুধুমাত্র একটি মানুষের অভাবে। বাংলার মানুষের এই দুর্ভোগের জন্য দায়ী এ খুনীরা, দায়ী ষড়যন্ত্রকারীরা।

তাই এই হত্যাকাণ্ডের স্বরূপ উদঘাটন করতে হবে। ষড়যন্ত্রকারীদের উৎখাত করতে হবে। সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান না ঘটলে বাংলার মানুষের মুক্তি আসবে না। গণতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ। আজ ১৫ আগস্ট। জাতীয় শোক দিবসে প্রতিটি বাঙালিকে শপথ নিতে হবে যে, বাংলার মাটি থেকে সামরিক শাসনের অবসান ঘটাবো। জনতার আদালতে খুনিদের বিচার করবো। ষড়যন্ত্রকারীদের মূলোৎপাটন করে বাংলার মানুষকে বাঁচাবো।

রচনাকাল : ১৯৮৯

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব

বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী

জন্ম: টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৮ই আগস্ট ১৯৩০ সাল

মাত্র তিন বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পিতার নাম শেখ জহুরুল হক, মাতার নাম হোসনে আরা বেগম। দাদা শেখ কাসেম চাচাত ভাই শেখ লুৎফর রহমানের পুত্র শেখ মুজিবুর রহমানের (বয়স ১১ বছর) সঙ্গে ফজিলাতুন্নেছার বিবাহ দেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দুই বোনের নামে লিখে দেন। বড় বোন জিন্নাতুননেছার বয়স যখন ৭ বছর এবং ফজিলাতুননেছার বয়স ৫ বছর সে সময় তাদের মায়ের মৃত্যু হয়। তখন থেকে বেগম ফজিলাতুননেছাকে শাশুড়ি কোলে তুলে নেন এবং নিজের সন্তানদের সঙ্গে লালন-পালন করেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে প্রাথমিক লেখাপড়া করেন। তখনকার সামাজিক রীতি অনুযায়ী বয়স দশ বছর হলে স্কুলে পাঠান অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হতো। পড়াশুনার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ থাকার কারণে গ্রামে গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেন। টুঙ্গীপাড়া গ্রামে শেখ বাড়িতে পরিবারের ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য মৌলভী এবং বাংলা, ইংরেজি ও অংক শিক্ষার জন্য গৃহশিক্ষক রাখার রেওয়াজ ছিল। পরিবারের সকল শিশু-কিশোর বিশেষ করে মেয়েরা বাড়িতেই শিক্ষা গ্রহণ করতো। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার প্রতি তার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। পরবর্তী জীবনে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের ছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, শান্ত, অসীম ধৈর্য ও সাহস নিয়ে জীবনে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেন। জীবনে কোনো চাহিদা, কোনো মোহ ছিল না। স্বামীর রাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বান্তকরণে সহযোগিতা করেছেন। বঙ্গবন্ধুর ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে যখনই অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হতো বেগম মুজিব পিতৃ সম্পত্তি থেকে অর্জিত অর্থ বিনা দ্বিধায় স্বামীর জন্য প্রেরণ করতেন।

তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। গরীব আত্মীয়-স্বজনদের যে কোনো অর্থনৈতিক সংকটে মুক্তহস্তে দান করেছেন। সংগঠনের নেতা-কর্মীদের রোগে

চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অর্থ সাহায্য করা, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য সাহায্য সব সময়ই করতেন।

বঙ্গবন্ধু ব্যস্ত থাকতেন রাজনীতি নিয়ে, ছেলে-মেয়েদের দেখাশোনা, পরিবার পরিজনদের খোঁজ খবর রাখা, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা ইত্যাদি দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতেন। আত্মীয় স্বজন ও দলীয় কর্মীদের সুখ দুঃখের সাথী ছিলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে কেউ কখনও রিক্ত হাতে ফিরে যেত না। অনাথ এতিমদের তিনি সব সময় সাহায্য করেছেন রাজনৈতিক অনেক জটিল পরিস্থিতিতে স্বামীর পাশে থেকে সৎ পরামর্শ দিতেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সঙ্গে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করতেন।

যেহেতু স্বামী ব্যস্ত থাকতেন কাজেই ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সব দায়িত্বই তিনি নিজের হাতে নিয়েছিলেন। স্বামীর আদর্শে অণুপ্রাণিত হয়ে তিনি সন্তানদের গড়ে তোলেন। মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার পর গোয়েন্দা সংস্থা বেগম মুজিবকে কয়েকবার জিজ্ঞাসাবাদ (ইন্টারোগেশন) করে, গ্রেফতারের হুমকি দেয়।

তিনি বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। ছায়ার মতো অনুসরণ করেছেন স্বামীর আদর্শকে বাস্তবায়ন করবার জন্য। জীবনে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেছেন। অনেক কষ্ট দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তাঁকে। বঙ্গবন্ধু জীবনের সব থেকে সুন্দর সময়গুলো কারাত্তরালে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। তাঁর অবর্তমানে মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করা, দলকে সংগঠিত করা, আন্দোলন পরিচালনা করা, প্রতিটি কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নেপথ্যে থেকে তিনি উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের বলিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন।

তাঁর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল, আন্দোলন চলাকালীন প্রতিটি ঘটনা জেলখানায় সাক্ষাৎকারের সময় বঙ্গবন্ধুকে জানাতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ নিয়ে আসতেন, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগকে সে নির্দেশ জানাতেন।

পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার চোখ এড়িয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। আবার ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়িতে আওয়ামী লীগের কার্যকরি সংসদের সভা চলাকালীন নিজের হাতে রান্না-বান্না করতেন এবং তাদের খাদ্য পরিবেশন করতেন। এই সংগঠনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান সংগঠিত করবার কাজে তার অবদান অপরিসীম। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার চক্ষু এড়িয়ে সংগঠনকে সংগঠিত করে গেছেন, তিনি ছাত্রদের নির্দেশ দিতেন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতেন।

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ, রাত একটার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তারা ধানমন্ডির ৩২ নং

সড়কের বাড়ি আক্রমণ করে প্রচণ্ড গুলি-গোলা চালায় এবং পর দিন অর্থাৎ ২৬ তারিখ সন্ধ্যায় আবার বাড়ি আক্রমণ করে। শেখ জামাল ও রাসেলকে নিয়ে বেগম মুজিব ঐ বাড়িতে ছিলেন। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শেখ কামাল ২৫শে মার্চ রাত্রে ছাত্রদের সঙ্গে রাস্তায় চলে যায়। পিতার গ্রেফতার হবার সংবাদ পেয়ে কামাল কার্ফুর ভিতরেই গেরিলা কায়দায় ৫০টি বাড়ির দেয়াল টপকে পরদিন সন্ধ্যায় মাকে দেখতে আসে।

৩২ নং ধানমন্ডির বাড়ি ২৬ মার্চ আক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দেয়াল টপকে সন্তানদের নিয়ে বেগম মুজিব পাশের বাড়িতে আশ্রয় নেন। হানাদার বাহিনী তাঁকে খুঁজতে থাকে। দিনের পর দিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লুকিয়ে লুকিয়ে দিন কাটান। অবশেষে একদিন হানাদার বাহিনী তাঁকে মগবাজারের একটা বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে ধানমন্ডি ১৮ নং রোডের একটা বাড়িতে নিয়ে বন্দি করে রাখে। বন্দি অবস্থায় ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনেক মানসিক যন্ত্রণা ও অত্যাচার ভোগ করেন। ১৭ ডিসেম্বর মুক্তিলাভ করেন। তিনি সেই বাড়িতে হানাদার বাহিনীর টানিয়ে রাখা পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেন এবং পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেন। নিজেই জয়বাংলা শ্লোগান দিতে শুরু করেন। ওই সময় হাজার হাজার মানুষ বাড়ির দিকে ছুটে আসছিল। যুদ্ধ শেষে একে একে ফিরে আসে জামাল, পরে কামাল। তখনও বঙ্গবন্ধুর কোন খবর জানা যায় নাই। এক বুক ব্যথা নিয়ে আশঙ্কা ভরা মন নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন।

তখনও তিনি জানেন না স্বামী কী অবস্থায় আছেন, ফিরে আসবেন কিনা? সে সময়টা ছিল তার জীবনে সব থেকে কঠিন সময়। অবশেষে ৮ই জানুয়ারি বিবিসি রেডিওর মাধ্যমে প্রথম জানা গেল যে, বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়েছেন। বাসায় জরুরি ভিত্তিতে টেলিফোন লাগানো হল। প্রথম ফোনে গলার আওয়াজ শুনলেন। তার পর থেকে স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসা পর্যন্ত তসবীহ হাতে যায়নামাজেই সময় কাটালেন। ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু ফিরে এলেন, প্রথমেই গেলেন তার প্রিয় জনতার মাঝে, পরে এলেন পরিবার-পরিজনের কাছে। বেগম মুজিব আশ্রয় পেলেন স্বামীর বিশাল বুকে।

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর পাশে থেকে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি মেরামত করে সংসার গড়ে তুলতে আত্মনিয়োগ করলেন বেগম মুজিব, পাশাপাশি দেশ গড়ার কাজেও স্বামীকে সহযোগিতা করতে সচেষ্ট হলেন। বিশেষ করে লাঞ্ছিতা মা-বোনদের সহযোগিতা করা, তাঁদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং ব্যক্তিগতভাবে তাদের পাশে গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা সম্পন্ন জীবন দান করেন।

তিনি সর্বদা স্বামীর পাশে থেকে দেশ ও জাতির সেবা করে গেছেন। দেশ ও দেশবাসীর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির জনককে নির্মমভাবে হত্যা করে খুনীরা। বেগম মুজিবকেও হত্যা করে। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে তাঁর শরীর ঝাঝরা হয়ে যায়, তিনি লুটিয়ে পড়েন শোবার ঘরের

দরজার সামনে। ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ড। বঙ্গবন্ধুর আজীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গী মরণকালেও সঙ্গী হয়ে রইলেন।

সারাটা জীবন তিনি শুধু ত্যাগই করে গেছেন। প্রয়োজনে নিজের গহনা বিক্রি করে স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আত্মত্যাগের মহিমায় বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রয়েছে অবদান। মৃত্যুর কোলে ঘাতকের আঘাতে তিনি ঢলে পড়লেন। একজন মুসলিম নারী হিসেবে যা তাঁর প্রাপ্য তাও তো তিনি পাননি। কাফন দাফনটুকুও তাদের দেওয়া হল না। রক্তাক্ত পরনের কাপড় নিয়ে শহীদি মৃত্যুবরণ করলেন। স্বামী, পুত্র, পুত্রবধূদের সঙ্গে একই সাথে চলে গেলেন। নীরবে তিনি করে গেলেন কত বড় আত্মত্যাগ। বাংলার মানুষ কি তাঁর কথা মনে রাখবে? ফেলবে কি দু'ফোটা অশ্রু এই মহীয়সী নারীর স্মরণে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার পংক্তি "রাজা করিছে রাজ্য শাসন রাজারে শাসিছে রাণী, রাণীর দরদে ধুইয়া গিয়াছে, রাজ্যের যত গ্লানি"।

তিনি অনুপ্রেরণা, শক্তি, সাহস, মনোবল যুগিয়েছেন স্বামীকে। তাই তো বাংলার মানুষ পেয়েছে আজ স্বাধীন বাংলাদেশ। পেয়েছে আত্মপরিচয়ের সুযোগ। বিশ্বের মানচিত্রে স্থান পেয়েছে একটি দেশ। আত্মপরিচয়ের সুযোগ পেয়েছে একটি জাতি। দিনের পর দিন চলে যায়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ঘুরে যায়, যুগের পর যুগ, কিন্তু জাতি হিসেবে আত্মপরিচয়ের জন্য, স্বাধীনতার জন্য কত রক্ত ঝরেছে, কত অশ্রু বিসর্জন হয়েছে। নীরবে কত আত্মত্যাগের কাহিনী ঘটে গেছে। সে খবর কে কতটুকু রাখে? আজ বাংলার মানুষ যে স্বাধীনতা পেয়েছে, তার জন্য কত মানুষের কত অবদান, সব কি জানা গেছে? না, যায়নি। কত অব্যক্ত কথা রয়ে গেছে।

যে ঘটনা ঘটেছে, যে কাহিনী পর্দার আড়ালে রয়েছে তার কতটুকু আর লিখে প্রকাশ করা যায়। লেখার মধ্য দিয়ে কতটুকুই বা বোঝা যায়? এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম-তাদের কাছে একটি আকুল আবেদন রইল-তারা যেন একবার খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে এই না বলা ইতিহাস, না জানা কথা।

শেখ হাসিনা

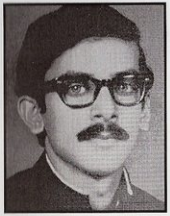

শেখ কামাল

বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ পুত্র
জন্ম: টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৫ই আগস্ট ১৯৪৯ সাল

শাহীন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি.এ (অনার্স) পাস করেন। ছায়ানটে সেতার বাদন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। নাটক মঞ্চ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একনিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন। ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অভিনেতা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শৈশব থেকে খেলাধুলায় প্রচ উৎসাহ ছিলেন। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

বিশ্বের ফুটবল ও ক্রিকেট খেলার মানোন্নয়নে তার শ্রম ও অবদান ছিল অপরিসীম। নতুন খেলোয়াড় তৈরী করার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়ে নিজেই মাঠে অনুশীলন করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই সুলতানা খুকুর সাথে তার বিয়ে হয়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন সংগ্রামী আদর্শবাদী কর্মী ও সংগঠক হিসেবে '৬৬-এর গণআন্দোলন ও '৭১ এর অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রলীগের প্রধান কর্মী হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতেই বাড়ি থেকে চলে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। লেফটেন্যান্ট হিসেবে কর্ণেল ওসমানীর এডিসি ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের হাতে নিহত হবার সময় তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এম.এ শেষ পর্বের পরীক্ষা দিয়েছেন। ভোরে সেনাবাহিনীদের বাড়ি ঘেরাওয়ের কথা শুনে নীচে নেমে এলে খুনীরা সবার আগে তাকে গুলি করে হত্যা করে। □

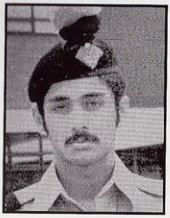

শেখ জামাল

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় পুত্র

জন্ম: টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ২৮ এপ্রিল ১৯৫৪ সাল

শৈশবে শাহীন স্কুলে পড়াশোনা, পরে রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। একটি সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রে গীটার বাজানা শিখতেন। ক্রিকেট খেলতেন আবাহনী মাঠে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ধানমন্ডি ১৮নং রোডের বাড়িতে মা শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিবের সঙ্গে বন্দি অবস্থায় থাকাকালে একদিন গোপনে গৃহত্যাগ করে কালিগঞ্জ হয়ে মুক্তাঞ্চলে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।

ঢাকা কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ক্লাসে থাকাকালে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটোর আমন্ত্রণে সেদেশে সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ নিতে যান। তার পর লন্ডনের স্যান্ডহার্স্ট আর্মী একাডেমী থেকে সেনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৭৫ সালের ১৭ই জুলাই তার ফুফাতো বোন পারভীন জামাল রোজীর সঙ্গে বিয়ে হয়। ১৫ আগস্ট তাদের একসঙ্গে গুলী করে হত্যা করা হয়। □

শেখ রাসেল

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র

জন্ম: ঢাকা, ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৪ সাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। বাড়ির ছোট্ট ছেলে হিসেবে সবার আদরের ছিল। বাড়ির রাজনৈতিক পরিবেশ ও সংকটের মধ্যেও সে চির সঙ্গী সাইকেল নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতো। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন দীর্ঘ নয় মাস পিতার অদর্শন তাকে এমনই ভাবপ্রবণ করে রাখে যে, পরে সবসময় পিতার কাছাকাছি থাকতে জেদ করতো। ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সবাইকে হত্যা করে তাদের লাশ দেখিয়ে তারপর রাসেলকে হত্যা করা হয়। তাকে কাজের লোকজন বাড়ির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নিয়ে যায়। কিন্তু ঘাতকেরা তাকে দেখে ফেলে। রাসেলকে বুলেটবিদ্ধ করার পূর্বে ওয়ারলেসের মাধ্যমে অনুমতি নেয়া হয়। রাসেল প্রথমে মায়ের কাছে যেতে চায়। মায়ের লাশ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখার পর সে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিল, 'আমাকে হাসু আপার কাছে পাঠিয়ে দিন'। □

শেখ আবু নাসের

বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ ভাই

জন্ম: টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, সেপ্টেম্বর ১৯২৮ সাল

শেখ আবু নাসের টুঙ্গিপাড়া ও গোপালগঞ্জে লেখাপড়া করেন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এবং বড় ভাই রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অল্প বয়সেই তাঁকে পিতার সঙ্গে পারিবারিক কাজকর্ম ও ব্যবসায় জড়িয়ে পড়তে হয়। এজন্য তাঁকে খুলনা শহরে বসবাস করতে হয়। পরবর্তীতে তিনি খুলনায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে তিনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করেন। ১৯৭৫-এ ঘাতকের হাতে নিহত হবার সময় বড় ভাইয়ের বাড়িতে ছিলেন। তিনি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এবং ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে যান। □

সুলতানা কামাল খুকু

শেখ কামালের স্ত্রী

জন্ম: ঢাকা, ১৯৮১ সাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী প্রকৌশলী দবির উদ্দিন আহমেদের ছোট মেয়ে। মুসলিম গার্লস স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ থেকে অনার্স পাশ করেন। ১৯৭৫ সালে এম. এ পরীক্ষা দেন। স্কুল থেকে আন্তঃখেলাধুলায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন বিভাগে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। বিশেষ করে লংজাম্পে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন হন।

মোহামেডান ক্লাবের পক্ষে ১৯৬৬ সালে পাকিস্তান অলিম্পিকে লংজাম্পে দ্বিতীয়, ১৯৬৮ সালে ঢাকার মাঠে পাকিস্তান অলিম্পিকে লং জাম্পে ১৬ ফিট দূরত্ব অতিক্রম করে রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক পান। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৯-৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করে জাতীয় ক্রীড়ায় অংশ নিয়ে স্বর্ণপদক অর্জন করেন। ১৯৭০ সালে নিখিল পাকিস্তান মহিলা এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় তিনি রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক পান। ১৯৭৩-এর লংজাম্পে স্বর্ণ পান। ১৯৭৪-এ লংজাম্পে ছাড়াও সুলতানা ১০০ মি: হার্ডলসে রেকর্ডসহ স্বর্ণপদক অর্জন করেন। বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু বিয়ের পূর্বে তাকে দেখে আশীর্বাদ করেছিলেন। এ বাড়ির বড় বউ হিসেবে তার বিপুল সমাদর হয়েছিল। □

পারভীন জামাল রোজী

শেখ জামালের স্ত্রী
জন্ম: সিলেট, ১৯৫৬

বঙ্গবন্ধুর ছোট্ট বোন খোদেজা হোসেনের মেয়ে। পিতা সৈয়দ হোসেন বঙ্গবন্ধু সরকারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন। ধানমন্ডি গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেন। বদরুন্নেসা আহমেদ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। মাত্র ৩০ দিনের বিবাহিত জীবন ছিল, মেহেদির রং তখনও দু'হাতে ছিল। বেগম মুজিবকে হত্যা করে ঘাতকেরা জামালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রোজী ও সুলতানাকে একসঙ্গে গুলি ছুঁড়ে হত্যা করে। এ বাড়িতে দুইবধূর শুভাগমন যেমন এক সাথে শোকাহত বিদায়ও একসাথে ঘটেছিলো। □

আবদুর রব সেরনিয়াবাত

বঙ্গবন্ধুর সেজ বোনের স্বামী
জন্ম : বরিশাল, ১৪ই চৈত্র ১৩২৭ বাংলা সন

বরিশাল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে বঙ্গবন্ধুর সহপাঠি ছিলেন। বেকার হোস্টেলেও একসঙ্গে থাকতেন। বঙ্গবন্ধুর সেজ বোন আমেনা বেগমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। কলকাতায় আই.এ ও বি.এ পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাস করে বরিশালে আইনজীবি ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৯৭০ এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রার্থী হয়ে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১এ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১২ই এপ্রিল কৃষিমন্ত্রী হন। ১৯৭৩ এর নির্বাচনেও জয়লাভ করেন এবং বঙ্গবন্ধু তাকে সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বঙ্গবন্ধু সরকারের কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার ও উৎপাদন এবং কৃষকদের সহায়তা প্রদানে তাঁর ভূমিকা ছিল যথেষ্ট জোরালো। একজন সৎ আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে তিনি সব মহলে প্রশংসিত ছিলেন। □

শেখ ফজলুল হক মণি

বঙ্গবন্ধুর মেজো বোনের বড় ছেলে
জন্ম: টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৯ সাল

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একনিষ্ঠ অনুসারী, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠন, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠিতা শহীদ শেখ ফজলুল হক মণি ১৯৫৬ সালে ঢাকা নবকুমার ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫৮ সালে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এ ১৯৬০ সালে বরিশাল বি.এম কলেজ থেকে বি.এ এবং ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ এবং পরবর্তীতে আইন পাস করেন।

ছাত্র অবস্থাতেই শেখ মণি সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬০ সালে তিনি ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে কুখ্যাত হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার কারণে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ছয় মাস বিনা বিচারে আটক থাকার পর তিনি মুক্তি লাভ করেন।

গণবিরোধী শিক্ষা নীতি ও সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে, ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তদানীন্তন কুখ্যাত গভর্নর মোনায়েম খানের হাত থেকে ডিগ্রি সার্টিফিকেট গ্রহণ না করার আন্দোলনে নেতৃত্বে দেয়ার জন্য শেখ মণির এম.এ.ডিগ্রী কেড়ে নেয়া হয়। কিছুদিন পর তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৬৫ সালের শেষাশেষি পর্যন্ত তাকে দেশরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়।-এ সময় সরকার তার বিরুদ্ধে কয়েকটি সাজানো মামলা দায়ের করে।

১৯৬৬ সালে শেখ ফজলুল হক মণি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রণীত বাঙালির স্বাধীকারের সনদ ঐতিহাসিক ছয়দফার সপক্ষে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছয় দফা আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীকে

সংগঠিত করা এবং ঐতিহাসিক ৭ জুনের হরতাল সর্বাত্মক সফল করার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ অবদান রাখেন। এ সময় সরকার শেখ মণির বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছিল। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর মুক্তিযোদ্ধা ও যুব সমাজকে সংগঠিত করে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে শেখ মণি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭২ সালের ১১ নভেম্বর আওয়ামী যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি ছিলেন আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তেজগাঁও আঞ্চলিক শ্রমিক লীগের সভাপতি হিসেবে শেখ ফজলুল হক মণি শ্রমিক লীগ ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করলে শেখ মণি অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হন।

শেখ ফজলুল হক মণি ১৯৭৩ সালে বার্লিন যুব উৎসবে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। তিনি বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের সাথেও সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন সফল সংগঠক, সুবক্তা ও সুলেখক। সম্পাদকীয় ছাড়াও তিনি স্বনামে ও ছদ্মনামে বহু রচনা করেছেন। ছয়দফার উপর ও তার লেখা ছোটগল্পের সংকলন 'বৃত্ত' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। ১৯৭৪ সালে শেখ মণির দ্বিতীয় গল্প সংকলন 'গীতা রায়' প্রকাশিত হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালো রাতে শেখ ফজলুল হক মণি ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী বেগম আরজু মণি ঘাতকের হাতে নিহত হন। সেই রাতে মণির জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ ফজলে শামস পরশ ও কনিষ্ঠপুত্র শেখ ফজলে নূর তাপস অলৌকিকভাবে রক্ষা পায়। তখন পরশের বয়স ছিল পাঁচ বছর এবং তাপসের মাত্র তিন বছর। □

বেগম আরজু মণি

শেখ ফজলুল হক মনির স্ত্রী
জন্ম: বরিশাল, ১৫ মার্চ ১৯৪৭ সাল

বরিশাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক এবং বি এম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও বি.এ পাস করেন। আবদুর রব সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠ কন্যা। ১৯৭০ সালে খালাত ভাই শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গে বিয়ে হয়। দু সন্তানের মা আরজুকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে গুলী করে হত্যা করে ঘাতকরা। ১৯৭৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম. এ পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ❑

কর্ণেল জামিল উদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার
জন্ম: গোপালগঞ্জ, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ সাল

১৯৫২ সালে ক্যাডেট হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং ১৯৫৫ সালে কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান থেকে ফিরে আসার পর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সচিবালয়ে যোগদান করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ভোর ৫টায় বঙ্গবন্ধু লাল টেলিফোনে তাকে সেনাবাহিনীর বাসভবন ঘেরাওয়ের কথা জানালে সাথে সাথে ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়ির দিকে রওনা হন। পথে সোবহানবাগ মসজিদের সামনে ঘাতকরা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য তিনি আত্মাহুতি দিয়েছেন এবং তার এ আত্মদান জাতি চিরকাল স্মরণ করবে। ❑

বেবী সেরনিয়াবাত

আবদুর রব সেরনিয়াবাতের কনিষ্ঠ কন্যা
জন্ম : বরিশাল, ২০ শে মে ১৯৮০ সাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল। ঘাতকের হাতে নিহত হবার সময় পিতার কাছে ছিল। □

আরিফ সেরনিয়াবাত

আবদুর রব সেরনিয়াবাতের কনিষ্ঠ পুত্র
জন্ম : ২৭শে মার্চ ১৯৬৪ সাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী উচ্চ বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিল। ঘাতকের গুলিতে নিহত হবার সময় ঢাকায় পিতার কাছে ছিল। □

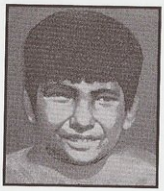

সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু

জন্ম : গৌরনদী, বরিশাল, ২২শে জুন ১৯৭১ সাল

আবদুর রব সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু ৪ বছর বয়সে নিহত হয়। ঢাকায় দাদার বাসায় বেড়াতে এসেছিল। □

শহীদ সেরনিয়াবাত

আবদুর রব সেরনিয়াবাতের ভাইয়ের পুত্র
জন্ম : বরিশাল, ২৬শে মার্চ ১৯৪০ সাল

বরিশাল বি এম স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, কলেজ থেকে আই.এ ও বি. এ. পাস করেন। ঢাকা থেকে আইন পাস করে বরিশাল কোর্টে আইনজীবি ছিলেন। তিনি দৈনিক বাংলা পত্রিকার বরিশাল সংবাদদাতা ছিলেন। ১৫ই আগস্টে চাচার বাসায় অবস্থানকালে তিনি নিহত হন। □

আবদুল নঈম খান রিন্টু

আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমুর খালাত ভাই
জন্ম : বরিশাল, ১লা ডিসেম্বর ১৯৫৭ সাল

বরিশাল জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেন। বরিশালের একটি সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে ঢাকায় এসেছিলেন এবং তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় অবস্থানকালে নিহত হন। □

বেবী মওদুদ

১৫ আগস্ট ১৯৭৫

বেবী মওদুদ

শুক্রবার, ২৯শে শ্রাবণ ১৩৮২, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ সাল। ফজরের আযান শুরু হয়েছে মাত্র। রাতের অন্ধকারের শেষ রেশটুকু ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। শ্রাবণের শেষ দিন, বাতাস ভেজা ছিল। গাছের পাতায় পাতায় মৃদু শব্দ তুলছিল সে বাতাসে।

ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কে হঠাৎ সামরিক জীপ ট্যাংক ও ভারী ট্রাকের ছোটাছুটির শব্দ শোনা গেল। তারপর গুলি আর গুলি, শুধুই গুলির শব্দ। আশপাশের বাড়িগুলোর বাসিন্দারা সে শব্দে সচকিত হয়ে উঠে, কান ভারী হয়ে উঠে। মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয় দেখা দিল, এমন গুলি তো আর হবার কথা নয়। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ মধ্য রাতে একবার শোনা গিয়েছিল। এখন আবার কেন? যাদের একাত্তরের অভিজ্ঞতা ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে রেডিও খুলেন। ঠিক তখুনি কিছু শোনা যায়নি। শোনা গেল আরও পরে। মেজর ডালিম কর্কশ কণ্ঠে বিকৃত বাংলায় ঘোষণা করলো : শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ধানমণ্ডির ৩২ নং রোডের বাড়িটি প্রথমে ঘিরে ফেলে ঘাতকরা। গেটের রক্ষীরা প্রতিরোধ করতে উদ্যত হলে তাদের থামান হয়। বঙ্গবন্ধুর প্রধান নিরাপত্তা অফিসার কর্নেল জামিল এ খবর পেয়ে ৩২ নং রোডের দিকে আসছিলেন। তাকে রাস্তার উপর গুলি করে হত্যা করা হয়। বাড়ির দোতলায় ততক্ষণে খবর চলে গেছে। সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠে দোতালয় এসেছে। টেলিফোন বেজে উঠলো দুবার। বঙ্গবন্ধু নিজেও দু'বার টেলিফোন করলেন। তাঁর বড় ছেলে শেখ কামাল গুলি ছোঁড়ার কারণ জানতে নিচে নেমে এলে তাকে বাড়ির অফিস ঘরের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয়।

প্রথমেই খুনীদের একটি দল নিচ তলার প্রতিটি ঘরে ঢুকে গুলি চালায়। বসার ঘরের আলমারী ও ছবিতে গুলি করে। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় লাইব্রেরীর বইয়ের আলমারীতে গুলি করে। কার্ল মার্কসের ও অনেক বইয়ের ভেতর এখনও গুলির ফুটোর চিহ্ন আছে, বুলেটও বিঁধে আছে। আলমারীর ভাঙ্গা কাঁচও আছে। লাইব্রেরীর পাশের কক্ষে বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসের ছিলেন, যিনি পাঁচদিন আগে এ বাড়িতে এসেছেন, তাকেও গুলি করে হত্যা করে ঘাতকরা। এরপর তারা নিচ তলায় খাবার ঘরে, রান্নাঘরে ঢোকে। তারা বড় বড় শ্বাস নিচ্ছিল, অস্থির তৎপর ছিল। কাজের লোকজনদের কেউ পালাল, কেউ দোতলায় গেল, কেউ ভয়ে মাটিতে বসে কাঁদতে লাগলো।

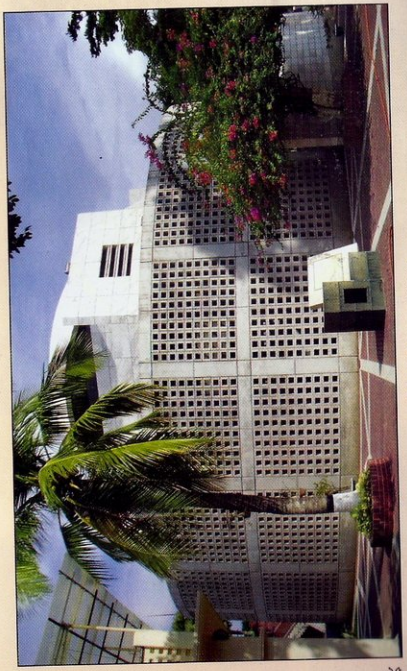

উন্নিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর মাজার

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে ঘাতকের বুলেটে নিহত বঙ্গবন্ধুর পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের মাজার, বনানী কবরস্থান

ঘাতকদের একজন দোতলায় উঠার সিঁড়ির প্রথম ধাপ পেরিয়ে দ্বিতীয় ধাপে দাঁড়ালো। বঙ্গবন্ধু লুঙ্গির উপর সাদা পাঞ্জাবী চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন ' কী ব্যাপার? এত গুলি কেন? কী হয়েছে? তোমাদের অফিসার কোথায়? ' নির্দেশ হয়তো ছিল বঙ্গবন্ধুকে দেখামাত্র গুলি করার। কিন্তু সৈন্যটি তা করতে পারলো না। অস্ত্র তুলেই নামিয়ে নিল। ঐ বিশাল ব্যক্তিত্বের সম্মোহনী শক্তি তাকে কি আচ্ছন্ন করেছিল? সে বললো 'স্যার, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।' বঙ্গবন্ধু প্রশ্ন করলেন, 'কেন? কোথায় যেতে হবে?'

হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে আরেকজন অস্ত্র তুললো বঙ্গবন্ধুর দিকে তাক করে। তারপর একটানা গুলি, গুলি শুধু গুলিই। বঙ্গবন্ধু পড়ে গেলেন লম্বা হয়ে সিঁড়িতে। বেগম মুজিব চলে এসেছিলেন তাঁর পেছনে, বঙ্গবন্ধু তাকে ভেতরে যেতে বলেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা কাজের ছেলে আবদুলও সেদিন বুলেট বিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়, আহত অবস্থায় সে ঘাতকদের দেখে, তাদের উল্লাস ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শোনে। ঘাতকরা চলে গেলে সে রক্তাক্ত শরীর নিয়ে বের হয়ে যায়। আবদুল এখনও সে স্মৃতি মনে করে শিউরে উঠে। এরপর খুনীরা বঙ্গবন্ধুর লাশ টপকে ভেতরে ঢুকে শোবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা ব্যারুল বেগম মুজিবকে গুলি করে হত্যা করে। বাথরুম থেকে টেনে বের কারে এনে বাকি সবাইকে গুলি করে। নীচ তলায় রাসেলকে কাজের লোকেরা আগেই নিয়ে গিয়েছিল। রাসেল কাঁদছিল, ফুপিয়ে ফুপিয়ে বলছিল, 'মার কাছে যাব। আমি মার কাছে যাব।' সৈন্যরা তাকে সবকটি লাশের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে মায়ের কাছে এনে গুলি করে হত্যা করে।

কারফিউ জারি থাকায় সেদিন পথঘাট ছিল জনশূন্য। খবরের কাগজ ছাপা হলেও বিক্রি হয়নি। বাজার বসেনি। দোকনপাট খোলেনি। অফিস আদালতও হয়নি। বড় রাস্তাগুলোতে সেনা জীপ ট্যাংক অনেকদিন ছিল। সকাল ৬টায় রেডিও থেকে বার বার মেজর ডালিম ঘোষণা করছিল যে, 'শেখ মুজিব খুন হয়েছে। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সামরিক আইন জারি হয়েছে।' সামরিক বিধিনিষেধ প্রচার হচ্ছিল। আর কাজী নজরুল ইসলামের ' আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' গানটির যন্ত্র সঙ্গীত বাজানো হচ্ছিল। খবরে জানা গেল খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতি হয়েছে। সন্ধ্যায়ও টিভিতে একই খবর। সামরিক আইনের বিধিনিষেধ জারি ও প্রচার করা হয়। সঙ্গীত বাজানো হয়। সেদিন বিদেশী বেতারের খবরে এ সংবাদটি প্রধান ছিল। সন্ধ্যায় বিবিসি এ সংবাদ প্রথম প্রচার করে। তবে ভয়েস অব আমেরিকা (ভোয়া) ভোর ছটায় প্রথম সংবাদটিই প্রচার করতে সমর্থ হয়। এই মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতম হত্যাকাণ্ডের খবর পূর্ণাঙ্গ না দিতে পারলেও সে মুহূর্তে বিভিন্ন দেশ বঙ্গবন্ধুর কথা উদাত্তভাবে প্রচার করছিল।

ঢাকায় সকাল দশটার মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেল যে, বঙ্গবন্ধু, বেগম মুজিব, শেখ কামাল, শেখ জামাল , শেখ রাসেল, কামাল ও জামালের নবপরিনীতা স্ত্রী সুলতানা এবং রোজি, বঙ্গবন্ধুর ভাই শেখ নাসের ও কর্ণেল জামিল ৩২ নম্বরে নিহত

হন। মিন্টু রোডে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত তাঁর এক কন্যা বেবী, এক পুত্র আরিফ, নাতি বাবু ও ভাতুষ্পুত্রকে মারা হয়। বাড়ির কয়েকজন কাজের লোক ও পুলিশকে ঘাতকরা হত্যা করে। তাঁর স্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সেজ বোন আমেনা বেগম ও মেয়ে বুলেটবিদ্ধ হন। তাদের হাসপাতালে নেয়া হয়। ধানমন্ডিতে শেখ মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ঘরে ঢুকে গুলি করে মারা হয়। তাঁর দুই শিশু পুত্র খাটের তলায় লুকিয়ে রক্ষা পায়। বঙ্গবন্ধুর রক্তাক্ত লাশ সেদিন ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে পড়ে ছিল। তবে তা ছিল সৈন্যদের কঠোর পাহারায়। অন্য বাড়ির লাশগুলো এনে এ বাড়ির লাশগুলোর সঙ্গে একত্রে রাখা হয়। রাতেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয় লাশ কীভাবে দাফন করা হবে। অনেক রাতে গোসল ও জানাজা ছাড়া বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া সব লাশ বনানীতে দাফন করা হয়। টুঙ্গীপাড়ার ওসিকে খবর পাঠানো হয়, পর দিন বঙ্গবন্ধুর লাশ যাবে সুতরাং কবর যেন খনন করা থাকে।

রাতে বঙ্গবন্ধুর লাশ বরফ দিয়ে ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে রাখা হয়। সারারাত দুশ্চিন্তা নিয়ে কঠোর সতর্কতার সঙ্গে তা পাহারায় রাখে একদল সৈন্য। লেঃ কঃ হামিদকে দায়িত্ব দেয়া হয় হেলিকপ্টারে করে লাশ টুঙ্গীপাড়া নিয়ে গিয়ে দ্রুত দাফন করে, কবর পাহারায় রেখে চলে আসার জন্য। সকালে লাশ বহনের জন্য একটা বাক্স এনে তাতে আবার বরফ দিয়ে সম্পূর্ণ লাশ মুড়ে নিয়ে সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যায়। শনিবার দিনও ঢাকা শহর ছিল থমথমে। সকালেই টুঙ্গীপাড়া থানার ওসি নূরুল আলম চৌধুরী সাহেব বঙ্গবন্ধুর বাড়ির মসজিদের ইমাম মৌলভী আবদুল হালিমের কাছে খবর দিলেন লাশ আসছে। সুতরাং কবর যেন খুঁড়ে রাখা হয়। ইমাম সাহেব আগের দিন দুপুরেই এই হত্যাকাণ্ডের খবর শুনে শোকাহত হয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধু ইমামকে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের সময় বলেছিলেন যে, 'আমার জানাজা আপনাকেই পড়াতে হবে।'

বাড়ির সামনে বঙ্গবন্ধুর স্নেহময় পিতা-মাতার মাজারে সাদা মার্বেল সেট বসানোর কাজ করছিল মিস্ত্রিরা। বঙ্গবন্ধুই এ পাথর সেট করানো কাজ করাচ্ছিলেন। এ পাথর তিনি নিজে পছন্দ করে কিনে টুঙ্গীপাড়া পাঠান। ইমাম সাহেব মিস্ত্রি আলী আসগর মিয়ার সাহায্যে দুটো কবর খনন করিয়ে রাখলেন। বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবের জন্য। ১২টা বেজে গেলে ইমাম ঘরে গিয়ে গোসল সেরে নামাজ পড়ে এলেন।

বেলা দেড়টায় একটা হেলিকপ্টার এসে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছে থানার পাশে মাঠে নামলো। প্যাকিং করা বরফ ঢাকা লাশ বহনের খাট নামানো হলো। লেঃ কর্ণেল হামিদের নেতৃত্বে মোট ১২ জন সৈন্য কফিন বয়ে আনল। পুলিশি পাহারায় চারদিকে খুব কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা। পুরো টুঙ্গীপাড়ায় কারফিউ জারি ছিল। জনগণকে আসতে দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধুর দুই মামা শ্বশুর শেখ মনসুরুল হক ও শেখ মনজুরুল হক কফিন বুঝে নিলেন। বাড়ির লোকজন আগেই অন্যত্র সরে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর মেজ চাচা ও ছোট চাচী লাশ দেখার অনুমতি পেলেন। লাশ থেকে বরফ সরানো হলো, বরফ গলা পানির সঙ্গে রক্তও গড়িয়ে পড়ছিল মাটিতে।

দুই চাচীর বুক ফাটা কান্নায়। একটা ময়লা সাদা মার্কিন কাপড়ে লাশটা ঢাকা ছিল। বরফে তা ভিজে যায়। বঙ্গবন্ধুর পরনে ছিল সাদা গেঞ্জী, পাঞ্জাবী ও কালো পাড়ের সাদা লুঙ্গি। পাঞ্জাবীর পকেটে চশমা ছিল, সারা শরীর রক্তাক্ত।

লেঃ কঃ হামিদ, ইমাম সাহেবকে দ্রুত লাশ দাফন করতে বললেন। লাশ দেখার পর ইমাম সাহেব বললেন, দুঘণ্টা সময় লাগবে। লেঃ কঃ হামিদ বললেন, কেন? ইমাম সাহেব বললেন, শরীয়ত অনুযায়ী গোসল করাতে ও জানাযা পড়াতে সময় লাগবে। লেঃ কঃ হামিদ এসব ছাড়াই লাশ দাফন করা যায় কিনা জানতে চাইলে ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, একজন মুসলমানের লাশ গোসল ছাড়াই দাফন করা যায়, যদি সে শহীদ হয়। হামিদ তখন অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন, আপনি দাফন করাবেন কি না? ইমাম বললেন, না, পারব না। যদি লিখে দেন যে শহীদ করে এনেছেন তাহলে পারি। ইমাম সাহেবের বুক জুড়ে যে শোকের কান্না, তা তাঁর মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছিল।

লে. ক. হামিদ বললেন, না সেটা লিখতে পারবো না। ঠিক আছে, গোসল করান, তবে দেরি করতে পারবেন না। কর্ণেল খুব টেনশনে ছিলেন। সৈন্য ও পুলিশদের বারবার সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকেন। সেই ১২ সৈন্য বঙ্গবন্ধুর লাশ ঘিরে থাকলো।

৫৭০ সাবান দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে যথারীতি গোসল করান হল। রেডক্রস থেকে চার ইঞ্চি পাড়ের সাদা শাড়ি এনে পাড় ছিঁড়ে ফেলে কাফনের কাপড় বানানো হল। একটা গুলি বঙ্গবন্ধুর মাথার পেছনে করা হয়েছিল। নয়টা গুলি চক্রাকারে বুকের নিচে করা হয়। পায়ের রগ কাটা ছিল, একটা আঙ্গুলেও গুলি লাগে। খুব দ্রুত লাশ দাফন হয়ে গেল। কবরের উপরে মাটি চাপা দিয়ে, উঠোনের বরই গাছের কাঁটাভরা ডাল চাপানো হল। হেলিকপ্টার চলে যাবার আগে বাইগার নদীর পানিতে রক্ত ধুয়ে টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে ফেলে যায়।

কবর পাহারার ব্যবস্থা করা হলো। বাড়ির দরজা সিল করে রেখে সৈন্যদের পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হলো। বঙ্গবন্ধুর পিতাকে দেখাশুনা করার জন্য সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল নির্মল। সেই নির্মল শুধু কান্নাকাটি করে সেখানে পড়ে রইলো। বঙ্গবন্ধুর কোনো আত্মীয় বা গ্রামের লোকজনদের কবরের কাছে যেতে দেয়া হতো না।

বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই শেখ নাসেরের স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে খুলনায় ছিলেন। বুধবার দিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার টেলিফোনে কথা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বাচ্চাদের নিয়ে চলে এসো।' শেখ নাসেরের স্ত্রী তখন সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের খবর শুনেই তিনি খুলনায় মায়ের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। তাদের খুলনার বাড়িও সিল করে রাখা হয়। বঙ্গবন্ধুর লাশ টুঙ্গিপাড়ায় নেয়া হচ্ছে খবর পেয়ে তিনিও সেখানে রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু আশেপাশের সব থানা পুলিশ সতর্ক ছিল। কঠোর নিরাপত্তার কারণে শেখ নাসেরের স্ত্রী বাড়ির পেছনের খাল পর্যন্ত গিয়েই ফিরে আসতে বাধ্য হন। সেসময় মোল্লার হাট থানার ওসি তার

নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৬ আগস্ট তিনি লঞ্চে কাটান। কারফিউ থাকায় কোথাও নামতে পারেননি। তাঁদের খুলনার বাড়ি ১৯৭৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সিল করা থাকে। এপ্রিল মাসে তিনি টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুর মাজারের চারপাশে বাঁশের ভাঙ্গা খুঁটি দেখতে পান। এটা বঙ্গবন্ধুর ফুপাত ভাইয়ের ছেলে নজীব আহমেদ করান। আগাছায় পূর্ণ ছিল। তিনি নিজে সব পরিষ্কার করান এবং ইঁটের গাঁথুনি দেন। বঙ্গবন্ধুর কবরের চারপাশে বাঁশের বেড়া দেন। তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি প্রতিবছর এই দিনে টুঙ্গিপাড়া নিজে গিয়ে মাজার দেখাশোনা করান। মিলাদ পড়ান। বঙ্গবন্ধুকে মাটি চাপা দিয়ে তার কবরের উপর বরুই গাছের ডাল চাপা দিয়ে রাখা হয় প্রায় দুবছর। চারপাশে তিন চটার বাঁশের খুঁটি পোতা ছিল। মাথার কাছে একটা হাসনা হেনা আর পায়ের কাছে একটা নারকেল গাছ–এই ছিল একমাত্র নিঃসঙ্গ অথচ প্রাণময় সঙ্গী। আর মধুমতি নদী থেকে আসা ভেজা বাতাস। পাশেই বাবা-মার মাজার। সামনের রাস্তা দিয়ে যে কেউ যেতো কবরের দিকে তাকিয়ে দেখতো। তবে দাঁড়াতো না। দোয়া দুরুদ পড়তো মনে মনে। মাজারে ফুলও দেখা যেত। এত কড়া পাহারার মধ্যে কিভাবে কে ফুল নিয়ে আসতো, কোথা থেকে ঐসব ফুল আসতো কেউ বলতে পারে না। কোটালীপাড়ার সিকান্দার পাগলা প্রায় দু'বছর পর্যন্ত সেখানে ছিল। সেই চিৎকার করে বঙ্গবন্ধুর কথা বলতো।

১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সময় বঙ্গবন্ধুর দু'কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানিতে ছিলেন। শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া পশ্চিম জার্মানীতে একটি উচ্চতর বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়ন করতে যান। ৩০ জুলাই শেখ হাসিনা ছেলেমেয়ে ও ছোট বোন রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে যান। বিমান বন্দরে যাবার আগে শেখ হাসিনা পিতার নিরাপত্তার কথা বেশ গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন। সেবার তাঁর মা বিমান বন্দরে বিদায় জানাবার সময় তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিলেন। মাকে ওভাবে কাঁদতে দেখে হাসিনা এক সময় বলেছিলেন, 'তুমি এভাবে কাঁদলে আমি যেতে পারব না মা।' সে কান্নার স্মৃতি আজও শেখ হাসিনা ও রেহানাকে ভারাক্রান্ত করে রাখে। রেহানা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি বোনের সঙ্গে বেড়াতে যান। ঐ সময় তারা ব্রাসেলসে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ১৩ আগস্ট রেহানা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে ঢাকায় ফিরে আসতে ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি জানান যে, রাষ্ট্রদূতকে খবর দেবেন সব ব্যবস্থা নিতে। ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খবর জার্মান রাষ্ট্রদূত তাদের জানান। দূতাবাস থেকে ড. ওয়াজেদকে অবিলম্বে বন ফিরতে বলা হয়। বনে ফিরে শেখ হাসিনাকে জানান হল, বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। শেখ হাসিনা শুধু বললেন, 'কেউ কি বেঁচে নেই?' পরে তারা ভারতে আসার সময় প্লেনে কাগজ পড়ে জানতে পারেন কে কীভাবে নিহত হয়েছেন। বাবা, মা, ভাই হারা দু'বোন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদেন। তাদের সান্ত্বনা দেবারও কেউ ছিল না।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৫ আগস্ট সকালে স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে যাবার সময় সংবাদটা পান এবং হতবাক হয়ে যান। ঢাকা

রেডিও থেকে তখন শুধু বঙ্গবন্ধু বিরোধী কথা ও গান প্রচার করা হতো। খান আতাউর রহমান ঐসব গানের রচয়িতা ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। দেশজুড়ে সব মানুষকে শুধু কাজ করার কথা বল হতো। বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ বড় রাস্তার মোড়ে দীর্ঘদিন ট্যাংক ও সৈন্য মোতায়েন ছিল। কারফিউ জারি হত সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। শোকাহত বাঙালির জাতীয়তাবাদ, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব গাথা একে একে বিনষ্ট হতে থাকল।

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খুনী মোশতাক কুখ্যাত অধ্যাদেশ জারি করলো যে, এই হত্যার কোন বিচার হবে না। অধ্যাদেশটি গেজেটে প্রকাশিত হলো:

Short title-The ordinance may be called indemnity Ordinance 1975.

Restrictions on the taking of any legal or other proceedings against persons in respons in respect of certain acts and things-(1) Notwithstanding anything contained in any law, including law relating to any defence service, for the time being in force, no suit, prosecution or other proceedings, legal or disciplinary, shall lie, or be taken, in, before or by any court, including the Supreme Court and Court Martial, or other authority against any person, including a person who is or has, at any time, been subjected to any law relating to any defence service, for or on account of or in respect of any act, mater or things done or step taken by such person in connection with, necessary step towards, the change of Government of the People's Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law of the Morning of the 15 August, 1975.

For the purpose of this section or certificate by the President, or a person authorised by him on this behalf, that any act, matter or thing was done or in preparation or execution of any plan for, or as necessary step towards the change of the Government of the People's Republic of Bangladesh and the Proclamation of Martial Law on the Morning of the 15th August, 1975 shall be sufficient evidence of such act, matter or thing having been done or step having been taken in connection with or in preparation of ececution of any plan for, or as necessary step towards, the change of Government and the proclamation of Martial law on that morning.

জেনারেল জিয়া এই অধ্যাদেশ সংবিধানের ৪র্থ তফশীল ৩ক অনুচ্ছেদে সংযোজিত করে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার যাতে না হয় সে ব্যবস্থা পাকা-পোক্ত করেন। এ এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

১৯৭৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালে কর্ণেল ওসমানী সম্মিলিত বিরোধী জোটের প্রার্থী মনোনীত হলে সেবারই প্রথম আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর মাজার জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ করেন।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে এক বর্ষণমুখর দুপুরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে লাখ লাখ ছাত্র-জনতা-কর্মী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁকে ঢাকা বিমান বন্দরে সংবর্ধনা জানান। শোকাকুল হৃদয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর ৩৩ বছর বয়স্ক কন্যা সেদিন ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার রাজনীতি হবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। জনগণের ভাত ও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠ করা। আমাদের আন্দোলন চলবে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নয়, সেনা শাসনের বিরুদ্ধে, যাদের দুঃশাসনের ফলে দেশে আজ জনগণে গণতান্ত্রিক অধিকারকে নস্যাৎ করা হয়েছে।'

১৮মে পুলিশ সদস্যরা টুঙ্গিপাড়ার বাড়ি এলাকা ছেড়ে চলে যায়। সৈন্যরা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল। ১৯শে মে শেখ হাসিনা লঞ্চযোগে ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়া যান। সেদিন তার ১০৩ ডিগ্রী জ্বর ছিল। বাবা, মা, ভাই, বোন ও আত্মীয়স্বজন হারানো শোক ছিল আবেগাপুত গভীরতাপূর্ণ। পরবর্তীতে সেই শোক শক্তিতে পরিণত হয়ে তাঁকে সাহসী করেছে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীরা ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ পর্যন্ত সদম্ভে দেশ শাসন করেছে। খন্দকার মোশতাক ছিল রাষ্ট্রপতি। একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর খবর দেশ-বিদেশে মিথ্যা ও বিকৃতভাবে প্রচারিত হয়। দুদিন আগে যেসব পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর গুনগান গেয়েছে, তারাই তাঁর বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করে। জেনারেল জিয়া ক্ষমতায় এসে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিদেশে দূতাবাসের বিভিন্ন চাকরিতে পুনর্বাসিত করে। খন্দকার মোশতাকের মামলা চলে। রাজনীতি বন্ধ থাকে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী কর্ণেল ফারুক, রশীদ পরে বিদেশে পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে তাদের হত্যাকার ে কথা স্বীকার করেছে। তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পরাজিত শত্রুরাই ছিল এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে যারা মেনে নিতে পারেনি, তারাই সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে। জেঃ এরশাদ বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছেন। জেঃ জিয়ার মতো তিনিও রাজাকার-দালালদের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মন্ত্রী বানিয়ে।

জানা যায়, ঘাতকের হাতে নিহত হবার পূর্বে বঙ্গবন্ধুর বেশিরভাগ সময় কেটেছে সাংগঠনিক কাজের ব্যস্ততায়। গণভবনে যাওয়া, ফাইলপত্র দেখা ও সাক্ষাৎকার সবই ঠিকঠাক চলছিল। এরপরও তিনি গভীর চিন্তামগ্ন থাকতেন। ৯ আগস্ট আবু সাইদ চৌধুরী মন্ত্রীপদে শপথ গ্রহণ করেন, ১০ আগস্ট চালনা বন্দর শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠনের আদেশে স্বাক্ষর দান এবং বন্দর শ্রমিকদের মজুরি ৮৫ ভাগ বৃদ্ধি করা হয়। ১১ আগস্ট তিনি ছোট বোনের মেয়ের বিয়েতে যান। ১২ আগস্ট পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বেলগ্রেড সফরে গেলে তার হাতে প্রেসিডেন্ট টিটোকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। ১৪ আগস্ট কোরীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টর বিশেষ দূত মি. সোয়ান চু এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ছবিটি সম্ভবত তাঁর সর্বশেষ সরকারি ছবি। ১৫ আগস্ট সকাল ৯টায় তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে যাবার কথা ছিল। ১৬ আগস্ট বাকশাল জেলা নেতৃবৃন্দের প্রশিক্ষণে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। অবশ্য সেদিনের কাগজ পাঠকের হাতে পৌঁছায়নি। ১৬ আগস্ট পত্রিকা প্রকাশিত হলেও বিলি করা হয় নি। ১৭ আগস্ট ৪ পৃষ্ঠার কাগজ প্রকাশিত হয়।

এদিন বাসস পরিবেশিত খবরে বলা হয়, 'পূর্ণ মর্যাদায় পরলোকগত রাষ্ট্রপতির লাশ দাফন সম্পন্ন'। খবরটি হলো, পরলোকগত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ গতকাল (শনিবার) বিমানে করিয়া তাহার নিজ গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় (ফরিদপুর) লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের পারিবারিক গোরস্থানে পূর্ণমর্যাদায় দাফন করা হয়। একজন সরকারী মুখপাত্রের বরাত দিয়া বাসস এ খবর জানাইয়াছে।' *–দৈনিক ইত্তেফাক*

বুধবার ৪ঠা চৈত্র ১৩২৬, ১৭মার্চ ১৯২০ সালে বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। আজীবন দেশ ও জনগণের কথা ভেবেছেন, অধিকার আদায়ের আন্দোলন করেছেন, জেল-জুলুম ছিল চিরসঙ্গী। 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ঘোষণা নিয়ে ফাঁসির মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছেছেন, পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী তাকে নির্জন কারাগারে বন্দি রেখে গোপন বিচার করে মৃত্যুদন্ড দিয়েছিল, তার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন তাকে জাতির জনকের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠিত করা এবং শহীদ পরিবার ও পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাসহ কোটি মানুষকে পুনর্বাসিত করে যখন তিনি দেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তখনই ঘাতকের দল তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করলো। শতাব্দীর মহানায়ক শেখ মুজিব, বাঙালি-বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন এবং তা সত্য, শুদ্ধতম মানবিক।

টুঙ্গিপাড়ার বাড়ির সামনের আঙ্গিনায় পূর্ব-দক্ষিণ দিকের খোলা আকাশের নিচে প্রায় ২০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে বঙ্গবন্ধুর মাজার। লম্বায় ১০ ফুট, পাশে ৫ ফুট। ১৯৮৮ সালের ১৫ আগস্টের পর শেখ হাসিনা মাজারটি সংস্কার করান। বঙ্গবন্ধু তাঁর বাপ-মার কবর বাঁধানোর জন্য যে সাদা পাথর কিনেছিলেন তার বেশ কিছু টুকরো বেচে যায়। শেখ হাসিনা সেগুলো দিয়েই মাজারে পাথর সেট করিয়ে নেন। কবরের উপরের অংশে খোলা সবুজ ঘন ঘাস এবং ফুল গাছ লাগানো আছে। মাজারের চারদিকে। টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনকের মাজার জিয়ারত করতে প্রতিদিন মানুষ আসে। ১৫ আগস্ট হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। সবুজ প্রকৃতির স্নিগ্ধতায় বঙ্গবন্ধু মাজার। মধুমতির ভেজা বাতাস তাঁর বড় প্রিয় ছিল। যে মাটিতে তাঁর জন্ম, যার স্নেহ-মমতা মেখে তিনি বড় হয়েছেন, যে প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ পরিপুষ্ট করেছে তাঁকে, দেশ ও মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে; সে মাটিতেই তাঁর রক্তাক্ত দেহ শায়িত, সমাহিত।

রচনাকাল : ১৯৯১

একটি সাক্ষাৎকার

এ বাড়ি শুধু আমাদের নয়, বাংলার জনগণের স্মৃতি বিজড়িত

(১৫ই আগস্ট ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী তারানা হালিম।)

তারানা হালিম : আমরা আজ এসেছি বত্রিশ নম্বরের ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবনে। আজ যা বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর নামে পরিচিত। এ বাড়িটির সাথে জড়িয়ে আছে বঙ্গবন্ধু আর তাঁর পরিবারের সদস্যদের সুখের-বেদনার স্মৃতি। আছে উচ্ছলতার স্মৃতি, আছে সংগ্রামের স্মৃতি, কখনওবা কষ্টের স্মৃতি। ১৫ই আগস্টের ভয়াল কালো রাত্রিতে এ বাড়িটিতে বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা ছিলেন না। আজ তারা আছেন, অন্যরা নেই।

প্রধানমন্ত্রী বা সরকার প্রধান হিসেবে নয়, বঙ্গবন্ধুর কন্যা হিসেবে আমরা আজ কিছু অজানা বিষয় জানবার ইচ্ছা নিয়ে আপনার মুখোমুখি হয়েছি। কী বলে সম্বোধন করি আপনাকে?

শেখ হাসিনা : আমাকে তো বাংলাদেশের মানুষ আপা বলে।

তারানা হালিম : আপা, তাহলে তো আমাদেরও আপা। আপনাকে?

শেখ রেহানা : নাম ধরেও ডাকতে পারেন, অসুবিধা নেই।

তারানা হালিম : আপাই বলি। আচ্ছা আপা, এই যে ৩২ নম্বরের বাড়িটি। এ বাড়িতে প্রথম কখন এলেন এবং বাড়িটি কীভাবে তৈরি হলো?

শেখ হাসিনা : এই বাড়িটিতে আমরা এসেছি ১৯৬১ সালের পহেলা অক্টোবর। এই বাড়িটির জায়গাটা নেয়া হয়েছিল অনেক আগে। তারপরে মাত্র দু'টো কামরা করে আমার মা আমাদের নিয়ে উঠেন। কারণ আমার মাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল বাড়ির জন্য। ১৯৫৮ সালে যখন মার্শাল ল' হলো, তখন তিন দিনের নোটিশ দিয়ে আমাদের বের করে দেওয়া হয়। আমরা সেগুনবাগিচায় ১১৫ নম্বর বাড়িতে, আব্বা টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং আব্বা এমপি ছিলেন। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। কিন্তু মার্শাল ল' যখন জারি করা হলো সমস্ত রাজনীতি

নিষিদ্ধ করা হলো এবং আব্বাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আমাদের মাত্র তিন দিনের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল বাড়িটি ছেড়ে দিতে এবং বাড়িতে যে নগদ টাকা পয়সা বা গাড়ি এমন কি টেপরেকর্ডার থেকে শুরু করে যা যা ছিল সব পুলিশ সিজ করে নিয়ে যায়। এই তিন দিনের নোটিশ দিয়ে যে বাড়ি থেকে বের করে দিল মা তখন বিপদে পড়লেন। এদিকে আমার বৃদ্ধ দাদা-দাদি, আমরা ছোট ছোট ভাই বোন, রেহানা তো খুবই ছোট, কেবল হাঁটতে শিখেছে। এই চারটা ভাই-বোন আমরা।

আমাদের হাত ধরে মাকে রাস্তায় পড়তে হলো। আর সে সময় এমন একটা অবস্থার কারণে যে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। পরিচিত একজনের একটা বাড়ি তৈরি হচ্ছে সেখানে আমরা দু'টো কামরার মধ্যে আশ্রয় নিলাম। তার পর সেগুনবাগিচায় একটা বাসায় ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আমরা থাকলাম। এর পরে আমার মার সিদ্ধান্ত যেভাবে হোক এখানে একটু মাথাগোজার ঠাঁই করে তিনি আসবেন। আব্বা তো তখন জেলে। আব্বা যখন জেল থেকে বেরিয়ে এলেন আলফা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকরি নিলেন। সেই সময় যা কিছু ছিলো, গাড়ি টাড়ি সব কিছু বিক্রি করে দিয়ে আমার মা কষ্ট করে বাড়িটা করতে শুরু করেন। আমার মনে আছে যে একটা লেবার খরচ দেবার মতো সেরকম টাকা ছিলো না বলে আমার মা নিজের হাতে ওয়ালগুলোতে পানি দিতেন। নিজেই ইটগুলি ভিজাতেন। কোনো মতে আমরা এই বাড়িতে এসে উঠলাম। এজন্য এই বাড়িটির সঙ্গে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িত। আমি যখন '৮১ সালে বাংলাদেশে ফিরে এলাম, তার পরই একটা নোটিশ পেলাম যে এই বাড়ির যে লোন নেয়া হয়েছিল হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশন থেকে, সেই লোন শোধ দেওয়া হয়নি বলে বাড়িটা নিলামে উঠে গেলো। তখনকার হাউস বিল্ডিং কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীদের আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ তারা সকলে মিলে ঐ সময় সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যে টাকাটা বাকি পড়েছে এই টাকা তারা আর নেবেন না। তারাই আমাকে ডেকে নিয়ে বাড়ির দলিলও আমাকে দিয়ে দিলেন এবং ঐ লোনটা মাফ করে দিলেন। কারণ খুব কষ্ট করেই আমার মাকে বাড়িটা করতে হয়েছিল এবং বাড়ির লোনের টাকাটা শোধ দিয়ে যেতে পারেননি।

তারানা হালিম : এই বাড়িতেই কি রাসেলের জন্ম?

শেখ হাসিনা : এই বাড়িতে রাসেলের জন্ম।

তারানা হালিম : শুধু রাসেলেরই এ বাড়িতে জন্ম?

শেখ হাসিনা : হ্যাঁ, শুধু রাসেলের জন্ম।

তারানা হালিম : রেহানা আপা আপনাকে জিজ্ঞেস করি। স্বাভাবিকভাবে এ বাড়িতে যখন এসেছি আমাদেরও মনে হচ্ছিল যে এই বাড়ির প্রতিটি জায়গায় আপনাদের হাজারও স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। পিতার সঙ্গে, ভাই বোনদের সঙ্গে কিছু কিছু টুকরো স্মৃতি যদি আমাদের সঙ্গে আপনারা একটু শেয়ার করেন।

শেখ রেহানা : এই বাড়িতে স্মৃতি চারি দিকে ছড়ানো এবং এটা খুবই কষ্টের যে এখানে বসে এই স্মৃতিচারণ করা। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি এই বাড়িতে। চারি দিকে আনাচে কানাচে এবং এই পেয়ারা গাছ, সামনে শিউলি ফুলের গাছ, সবকিছুই সব জায়গায় রয়ে গেছে এবং আসল যারা তারা নেই। সকালে আব্বা যখন মর্নিং ওয়াকে যেতেন, যখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে থাকতেন, শিউলি ফুল তুলে মালা বানিয়ে তাকে দিতাম। এই বারান্দায় বসে আব্বা খবরের কাগজ পড়তেন, আমি এসে আব্বার সঙ্গে বসতাম। আমরা তিন ভাই বোন কামাল ভাই, জামাল ভাই এবং আমি এখানে মাঠে খেলা, বা উপর থেকে লাফিয়ে পড়া। বাড়িতে ঢোকার সময় এগুলো সবসময়ই মনে পড়ে। রাসেল তো আমাদের চেয়ে অনেক ছোট ছিল।

তারানা হালিম : আচ্ছা আপা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করি। টুঙ্গি পাড়ায় আমি নিজে দেখেছি বহুদূরের অজানা অনাত্মীয় মানুষরা বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে এসে চিৎকার করে কাঁদে, দোয়া দরুদ পড়ে। এই যে এতগুলো বছর পেরিয়ে গেছে তার পরও তার জন্য মানুষ এতটা আবেগ ধারণ করে এটার কারণ কী বলে আপনি মনে করেন?

শেখ হাসিনা : আসলে আমি সন্তান হিসাবে এতটুকু বলতে পারি, আমার বাবা আমাদের যতটুকু ভালোবাসতেন, আমার মনে হয় তার থেকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসতেন এদেশের মানুষকে। কারণ মানুষের প্রতি তার যে অগাধ ভালোবাসা আর সব সময় তিনি বলতেন যে আমাদের দেশের মানুষ এত গরিব এত কষ্টে থাকে আমি একটা কিছু আমার দেশের মানুষের জন্য করে যাবো। মানুষ ভালোভাবে থাকবে, মানুষ একটা সুন্দর জীবন পাবে, দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবে। কারণ মানুষের কষ্ট আমার বাবাকে খুব বেশি পীড়া দিত। যে কারণে উনি নিজের জীবনটাই তো স্যাক্রিফাইস করে দিলেন মানুষের জন্য। নিজের জীবনের সব আরাম আয়েস সুখ-সুবিধা সব কিছু ত্যাগ করে দিলেন এদেশের মানুষের জন্য। আমার যেটা মনে হয়, এই যে মানুষের প্রতি ভালোবাসা, কারণ ভালোবাসা এমন একটা জিনিস যার জন্য ভালোবাসা থাকে সে কিন্তু বুঝতে পারে। বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এ জিনিসটা মনে প্রাণে উপলব্ধি করে যে তাদের তিনি প্রচুর ভালোবাসতেন এবং এই মানুষগুলোর জন্যই তো তিনি সারাটি জীবন কষ্ট করেছেন। সেই '৪৭ সাল থেকে নিয়ে '৭১ সাল ২৪টি বছর, এই ২৪ বছর উনি সংগ্রাম করেছেন বার বার জেলে গেছেন, বা কত অত্যাচার কত অবিচারের শিকার তিনি হয়েছেন। কিন্তু কোন দিন বাংলাদেশের মানুষের প্রশ্নে উনি তো আপোষ করেন নি। আর এই ২৪ বছরের মধ্যে তো ১৪ বছর জেলেই কাটিয়েছেন। আমরা সন্তান হিসাবে যখন আব্বা জেলে তখন আমাদের কষ্ট হয়েছে। কখনও আমাদের স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, কখনও টিচার বন্ধ হয়ে গেছে, কখনও পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেছে। বার বার আমাদের ধাক্কা খেতে হয়েছে। বার বার আমাদের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। তারপরেও উনি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের জন্য সারাটা জীবন

কষ্ট করেছেন। আমার যেটা ধারণা, তিনি আন্তরিকতা ও সততার সাথে মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন এবং মানুষের জন্য কিছু করতে চেয়েছেন। এই যে মানুষের জন্য কিছু করতে চাওয়া এই জিনিসটা আসলে মানুষ কিন্তু মন প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। আর উপলব্ধি করতে পারে বলেই এখন পর্যন্ত মানুষ চোখের পানি ফেলে। আর যত বেশি দিন যাচ্ছে আরো বেশি ঘটনা গুলো জানতে পারছে তত বেশি উপলব্ধি করতে পারছে।

তারানা হালিম : আচ্ছা আপা আর একটি প্রশ্ন করি। বঙ্গবন্ধু নিজে যে এভাবে রাজনীতির সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন, তিনি কি কখনও চাইতেন যে তার কোনো পুত্র বা সন্তান রাজনীতিতে আসুক, সেভাবে কি তিনি কাউকে তৈরি করেছিলেন?

শেখ হাসিনা : আসলে আমাদের পরিবারের অবস্থাটা এমন ছিলো যে কে যে রাজনীতিতে আসবে আর কে আসবে না এরকম কোনো পরিবেশই ছিলো না। আমরা সবাই একসঙ্গে জড়িত। সামগ্রিকভাবে সবাই সংগ্রামের সাথে জড়িত এবং আমরা স্কুলে থাকতে, কলেজে থাকতে প্রত্যেকেই তো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলাম। তারপর আমার মা, আমি তো মনে করি, আমার মায়ের যে রাজনৈতিক চেতনা, মায়ের যে অবদান, মায়ের যে আত্মত্যাগ, আজকে যদি ঘর থেকে এই সাহসটা এই প্রেরণাটা না পেতেন আর মা যদি সব সময় আরাম আয়েসে থাকার কথা চিন্তা করতেন বা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য চিন্তা করতেন বা আমার বাবাকে উত্যক্ত করতেন, তাহলে তো উনি পারতেন না। তা হলে তো ওনার পারিবারিক পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যেত বা দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে, মানুষের প্রশ্নে আমার মায়ের যে অবদান, এই যে বছরের পর বছর আব্বা জেলে–তার অবর্তমানে পার্টিকে সংগঠিত করা, সংগঠনকে ধরে রাখা, আব্বার সঙ্গে যোগযোগ করা, আব্বার বিরুদ্ধে একটার পর একটা মিথ্যা মামলা, প্রতিটি মামলা লড়ে যাওয়া, আমার মাকেই তো করতে হয়েছে। যে কারণে বলবো, আমাদের পারিবারিক পরিবেশটাই ছিল–আমাদের সবারই রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে জন্ম, এভাবে আমরা মানুষ হয়েছি। ঠিক আমাদের কাউকে কোনো দিন কোনো পদে যেতে হবে বা কোনো কিছু হতে হবে বা আমরা কিছু হবো এই চিন্তাটা কখনো আমাদের মাথে ছিলো না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে সংগঠনের প্রয়োজনে যদি কেউ কখনও আমাদের কোনো দায়িত্ব দিয়েছে আমরা পালন করেছি। কিন্তু নিজেরা কেউ কখনও চিন্তাই করিনি যে এটা হতে হবে, ওটা হতে হবে।

তারানা হালিম : তাহলে রেহানা আপা এবার আপনাকে ছোট একটা প্রশ্ন করি। আপনি ছোটবেলা থেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেই বেড়ে উঠেছেন। ভবিষ্যতে কোন দিন কি আপনি রাজনীতিতে আসবেন?

শেখ রেহানা : রাজনীতিতে ওভাবে ঘটা করে আসার বা কে যে কখন আসে কেউ জানে না। স্কুলে কলেজে ছিলাম কিছুটা জড়িত, পুরাপুরি না থাকলেও। কিন্তু মনে হয় একজন এখন যখন আছে তাকে সাপোর্ট দেওয়া, পিছন থেকে এটাই

বোধহয় ভালো। দেশের মানুষের জন্য যদি কিছু করতে ইচ্ছে করে রাজনীতি না করে সামাজিকভাবে করা যায়, আমাদের এই বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের মাধ্যমে। আব্বার যে স্বপ্ন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এটা রাজনীতির বাইরে থেকেও করা যায়।

তারানা হালিম : আপা আপনারদের কথা শুনে মনে হলো যে রাজনীতির কারণে আপনারা প্রায়ই পিতৃ-সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হতেন, তো সেই শিশুকালে কখনও কি এই ধরনের আপনাদের মনে হতো যে, রাজনীতি আপনাদের পিতাকে আপনাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে বা রাজনীতিকে কি আপনাদের প্রতিপক্ষ বলে মনে হতো?

শেখ রেহানা : হ্যাঁ, সেটাতো কিছুটা মনে হতো, বিশেষ করে আমার। যেমন আব্বা জেলে থাকলে ওটাকে আমি মেনে নিতে পারতাম না। কারণ স্কুলে যখন সবার অভিভাবকরা যেতেন, আমাদের হয়তো মাকে যেতে হতো। আবার কোনো অনুষ্ঠানে সবার বাবা-মা আসছেন, আমার বাবা-মা দু'জন একসঙ্গে আসতে পারছেন না, তখন খুব খারাপ লাগতো। বন্ধুরা হয়তো ক্ষেপাতো যে তোমার বাবা কোথায়, জেলে। কেনো জেলে? কী করে? রাজনীতি করে। রাজনীতি করে কত বেতন পায়? শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকেও এই ধরনের প্রশ্ন আসতো। তখন খুব কষ্ট লাগতো। তার পরে ঈদের সময় বিশেষ করে সবার বাবা গিয়ে কাপড় কিনে নিয়ে আসছে, আমরা সে থেকে বঞ্চিত। আব্বা দোকান পাট যাওয়া একদম পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমার জেদ যে আমাকে কিনে দিতেই হবে। কারণ আমি যেন স্কুলে গিয়ে বলতে পারি যে আমাকে আমার বাবা কিনে দিয়েছেন। আব্বা মনে হয় জীবনে দু'বার নিউমার্কেটে গিয়েছিলেন, সেটা আমার জন্য। ঐ সময় খুব কষ্ট লাগতো, খারাপ লাগতো। কোনো কিছুতে যেতে গেলে কেউ আদর করে নিতো যে শেখ সাহেবের মেয়ে। আবার কোনো জায়গায় গানে হোক বা নাটকে হোক বা স্কুলে কোনো পরীক্ষায় প্রথম হলে অনেক সময় তারা প্রাইজটা দিতে চাইতো না। কে প্রাইজটা দিয়ে আবার তার চাকরিটা চলে যাবে। তখন কষ্ট হতো, যে কেন আবার এসবের মধ্যে যাই। আমি প্রথম পুরস্কারটা পেয়েও নিতে পারলাম না। তবে অনেক বন্ধুবান্ধবও সাথে মিশতে চাইতো না যে কার বাবার চাকরি চলে যায়, কার মায়ের চাকরি চলে যায়। আবার অনেকে ভয়ও পেতো না। সেটা হয়তো বুঝতো না, খেলতে আসতো। তখন মনে হতো যে (বাবা) কেন রাজনীতিতে, এসব করার কী দরকার এবং যেভাবে অন্যান্য ফ্যামিলি চলে আমরা কেন সে রকম থাকি না।

শেখ হাসিনা : ওর অবশ্য ছোট হওয়াতে অনেকগুলো সুবিধা ছিল। যেমন আব্বাকে সে দুইবার লোকানে নিতে পেরেছে যেটা আমি কিন্তু পারিনি। আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি, আর আমার সেই সাহসও ছিল না কখনো যে আব্বাকে বলি যে এটা দিতে হবে। কিন্তু সে শুনতো না, আমার মনে আছে, ঠিক আমরা বাইরে যাবার আগে তার যত কাপড়চোপড় ছিলো, কে কে কোন কোন জিনিস তাকে উপহার দিয়েছে ওগুলো সব একটা গাট্টি বেঁধে রেখে দিয়ে আব্বাকে বলছে, আমি মানুষের দেওয়া জিনিস পরবো কেন? আমার আব্বা আমাকে দিবে, তা'না হলে আমি পরবো না।

তারানা হালিম: তাহলে বঙ্গবন্ধু পিতা হিসাবে কারো প্রতি ভালোবাসা একটু বেশি দিয়েছেন এরকম কিছু চোখে পড়েছে আপনার?

শেখ হাসিনা : যে বেশি আদায় করে নিতে পারে সেতো বেশি পাবেই। তবে আমার ছোট বোনটাই সবসময় আদায় করে নিয়েছে। আসলে ও আমাদের সবার আদরের।

শেখ রেহানা : তবে কোনো কিছু প্রয়োজন হলে সেটা আবার আপাকে দিয়ে আমাদের সুপারিশ করাতে হতো।

শেখ হাসিনা : আবার বিপদে পড়লে তখন আমার কাছে এসে আমাকে দিয়ে সেটা উদ্ধার করাতো।

তারানা হালিম : আচ্ছা, আপা এটা শোনা কথা, অনেকে অনেক সময় বলেন যে ১৫ই আগস্টের আগে বঙ্গবন্ধুকে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে কেউ যদি বলতেন যে আপনি ৩২ নম্বরের ঐখানে একটা বাসায় থাকেন, কোনো সিকিউরিটি নেই তো আপনি গণভবনে কেন থাকেন না। উনি নাকি প্রায়ই এই জিনিসটা হেসে উড়িয়ে দিতেন যে পাকিস্তানিরা আমাকে মারেনি আর বাঙালিরা, তারা তো আমাকে প্রচ ভালোবাসে। তাদের মধ্যে কেউ শত্রুতা করেই হোক আর স্বার্থের কারণেই হোক তারা কখনোই আমাকে কিছু করবে না। আপনার কি মনে হয় এই বিশ্বাসের কারণে তিনি এই ৩২ নম্বরের একটি অরক্ষিত বাড়িতেই রয়ে গেছেন?

শেখ হাসিনা : এই বাড়িটা, আমি যেটা আগে বলেছি যে এটা তিল তিল করে মায়ের হাতে গড়া। আর মায়ের একটা চিন্তা ছিল যে 'কোন শান-শওকতের মধ্যে আমার ছেলে মেয়ে মানুষ হোক আমি তা চাই না। একটা সাদা সিধে জীবন যাপন করুক এটাই আমি চাই'। আর আব্বার একটা অগাধ বিশ্বাস এদেশের মানুষের উপর। যেমন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তাকে ফাঁসি দিয়ে মারার চেষ্টা করা হলো। বাংলাদেশের মানুষ আন্দোলন করে তাঁকে বের করে নিয়ে এলো। মুক্তি দিতে পাকিস্তানি শাসকরা বাধ্য হলো। তাঁর ডাকেইতো এই দেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করেছে। তিনি এত বছর স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, এত বছর যুদ্ধ করেছেন এবং দেশের মানুষের জন্য কাজ করেছেন সে কারণে তাঁর সবসময় একটা চিন্তা ছিল যে, আমি আমার দেশের মানুষের জন্য এত কিছু করেছি আর সেই মানুষ আমাকে কেন মারবে, সে মানুষ আমাকে মারবে না–একটা বিশ্বাস ছিল, অন্ধ বিশ্বাস ছিল আমি বলবো। আর এই বিশ্বাসের বলেই তিনি এই বাড়িতেই থেকেছেন এবং অত্যন্ত সাদা সিধে জীবন যাপন করেছেন। যার ফলে যা ঘটার ঘটলো। হয়তো গণভবনে যদি থাকতেন তাহলে হয়তো আরো সুরক্ষিত অবস্থায় থাকতেন। হয়তো এত সহজে এ ধরনের ঘটনা খুনিরা ঘটাতে পারতো না এবং খুনিরা হয়তো অন্য কোনো প্রক্রিয়া নিতো, কারণ পৃথিবীর বহুদেশেই তো দেখা যায় যে সরকার প্রধানদের তারা হত্যা করেছে নানা ষড়যন্ত্র করে। আমি জার্মানিতে যাওয়ার আগে আব্বার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়। তখন আমি নিজেও কিন্তু

বলেছিলাম। কেন যেন সব সময় একটা আতঙ্ক কাজ করতো। আমি তখনও বললাম যে, আব্বা এই বাড়িতে আর থাকবেন না, আপনি গণভবনে গিয়ে থাকেন। এটা একটা এত ছোট্ট রাষ্ট্রপতির জন্য, দিন-রাত এত লোকজন আসতো, বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা এবং সময় ছিল না, নিয়ম ছিল না।

তারানা হালিম : রেহানা আপা, আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আপনার ১৫ই আগস্টের আগে শেষ কী কথা হয়েছে বা আপনার মায়ের সঙ্গে?

শেখ রেহানা: ১৩ই অগাস্টে আমার কথা হয়। আমি যাওয়ার আগে আব্বা আমাকে বলেছিলেন যে তুইতো সাতদিনের বেশি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি না, শুধু শুধু যাচ্ছিস, আমার পয়সা কয়টা নষ্ট করবি। আমি বললাম যে, না আমি থাকতে পারবো, আপার সঙ্গে থাকবো। যখন জানালাম, আমার ভালো লাগছে না, তখন আব্বা খুব হাসলেন এবং বললেন, আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি হুমায়ুনকে। তখন হুমায়ুন রশিদ সাহেব (স্পিকার) ছিলেন রাষ্ট্রদূত। আপা বললেন যে, তুই আর কয়টা দিন থেকে যা। আমার কথা ছিলো যে আমি তখনই চলে আসবো। আর মায়ের সঙ্গে কথা হলো, মা বললো যে বাসা একদম খালি তুই চলে আয়, ভালো লাগছে না। আমি আবার ঠাট্টা করে বললাম যে, কেন দু'টো বউ ঘরে। আমাকে তো বিয়েই দিয়ে দিবে, অভ্যাস করো। মা বলেন, না চলে আয় তুই। কারণ জয়, পুতুল নেই, আপা নেই, আমি নেই। আর সারা বাড়িতে তো তখন আমি একাই হেঁটে করে বেড়াতাম। কিন্তু বুঝতে পারিনি যে ওটাই আমার জীবনের শেষ কথা হবে আব্বার সঙ্গে।

তারানা হালিম: আপা আপনি প্রথম যখন এখানে ফিরে এলেন তখন কি এই বাসায় আসতে পেরেছিলেন, ১৫ই আগস্টের পর?

শেখ হাসিনা : না। আমি যখন '৮১ সালে আসলাম, তখন আমাকে বাসায় ঢুকতে দেওয়া হয় নাই। তখন জেনারেল জিয়া ছিল রাষ্ট্রপতি। আমরা বাড়ির গেট পর্যন্ত আসলাম। বাড়িতে পুলিশ পাহারা, আমাকে ঢুকতে দিল না। বাড়িতে সিল মারা, তালা দেওয়া। আমি বললাম যে, আমি তো বাড়িতে মিলাদ পড়বো সবার জন্য, আমাকে মিলাদ পড়াতে দেওয়া হয়নি। আমি রাস্তার মাঝে বসে মিলাদ পড়ালাম। এসে মাঝে মাঝে গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতাম, ঢুকতে দেয়নি। কেমন লাগতে পারে যে আমাদের বাড়িতে আমাদের ঢুকতে দিল না। তখন যেন পুরো বাড়ি একটা বিধ্বস্ত বাড়ি ছিল।

তারানা হালিম: তার পরে কখন প্রথম ঢুকলেন?

শেখ হাসিনা : জিয়ার মৃত্যুর পরে যখন আবদুস সাত্তার সাহেব প্রেসিডেন্ট তখন তিনি এ বাড়িটা ছেড়ে দিলেন। অবশ্য তখন যে বাড়িটা দিলো তাদের মনে হয় একটা অন্যরকম উদ্দেশ্য ছিলো, বাড়িতে কী কী পাওয়া গেছে ৭২ পৃষ্ঠার একটা তালিকা করে আমাকে দিবে। তখন আমি বললাম যে, আমার একজন ল' ইয়ার দিয়ে এবং তার মাধ্যমে আমি নেবো। তখন বললো যে, না আমাকেই সই করে

নিতে হবে। যখন আমি নিলাম তখন তো বাড়িটায় ধুলাবালি, প্রতিটি জিনিস পোকায় কাটা, ময়লা আবর্জনা ভরা সারা বাড়িতে। উইপোকায় সারা বাড়িতে সবকিছু তছনছ করা, আর বাড়ির প্রতিটি জিনিস ছড়ানো ছিটানো, রক্তে মাখা কাপড়চোপড় সব বিছানার উপর ছিল।

তারানা হালিম: আমাদেরও খুবই কষ্ট লাগে যে, আপনাকে এই বেদনার ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে। এই বাড়িতে এই যে আপনারা এলেন তারপর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর করলেন। আমার একটা ঘটনার কথা খেয়াল আছে, আপনি বলেছিলেন যে, আমি মৃত্যুকে খুব একটা ভয় পাই না, বরং আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে ১৫ই আগস্টের এই রাতে আমি যে কেন ছিলাম না এই বাড়িটিতে– এই যে আপনার ভাবনা, এই ভাবনাগুলোর সাথে আপনি বোঝাপড়া করেন কীভাবে?

শেখ হাসিনা : আসলে আমি কখনো বিদেশে যেতে চাইতাম না। দেশ ছেড়ে দেশের বাইরে থাকতে আমার ভালো লাগতো না। আমার বিয়ের পরে একবার ওয়াজেদ সাহেবের সঙ্গে বাইরে গেলাম, ছয়মাস থাকতে না থাকতে আব্বা গেলেন। আমি আব্বার সঙ্গে চলে আসলাম। একদম বাইরে যেতে ইচ্ছে করতো না। তখন যা হোক আমরা গেলাম, ইচ্ছা ছিলো যে আমরা দু'মাস পরে চলে আসবো। আব্বার রুমানিয়া আর পোল্যান্ডে সফরে যাওয়ার কথা ওই সময়, আব্বার সাথে ফেরত চলে আসবো। কিন্তু তাতো আর হলো না। আসলে আমরা কোনোও দিন ভাবতেই পারি নাই যে এরকম একটা ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটবে। আসলে এত কষ্টকর যে বলা সত্যি কঠিন। যখন এ ঘটনা জানলাম, তখন আমরা এত ছোট আমার তখন মনে হতো ওকে আমি কীভাবে সান্ত্বনা দিবো। আর এত মৃত্যু আমার চোখের সামনে হয়ে গেলো মা, বাবা, ভাই সব হারাবার পর আসলে বেঁচে থাকার তো কোনো অর্থই খুঁজে পাইনি। মানে বেঁচে থাকাটাই একটা কষ্টকর। এই যে বেঁচে আছি, প্রতিদিন যাচ্ছে, এটা অত্যন্ত কষ্টকর। সেজন্যই মৃত্যুকে আমি কোনো পরোয়া করি না। কারণ মৃত্যু তো আমার আশেপাশে সবসময় এসেছে, কতবার আমার ওপর অ্যাটেম্প্ট হয়েছে। আমি কখনো পরোয়া করিনি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমি এসেছি আমার বাবা যে কাজটা করতে চেয়েছিলেন সেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো, বাংলাদেশের মানুষের জন্য কিছু করে যাওয়া, আসলে সেই কাজটাই আমি করতে চাই। এর জন্য জীবনের যদি একটু ঝুঁকি নিতে হয় বা আমার বাবা মায়ের মতো যদি আমাকে মরতেই হয় সেজন্য তো আমি সব সময় প্রস্তুত। যতই গুলি আসুক, যতই মৃত্যু আসুক, আমি কখনও মৃত্যুকে পরোয়া করি না, ভয় করি না। বরং মাঝে মাঝে মনে হয় যে সবাই তো এক ঝাঁক বুলেট নিয়েই মারা গেছে। আমার মা, মায়ের তো কোনো অপরাধ ছিলো না। এই ছোট্ট রাসেল, তাকেও তো গুলি করে মারা হলো। জানি না সেই বুলেটের যন্ত্রণা কী। সেটা তো আমরা বলতে পারি না। আমি যদি একটা গুলি খেয়ে মারা যাই তাহলে কোনো আফসোস থাকবে না। অন্তত ঐ যন্ত্রণা ও বেদনার কষ্ট কিছুটা তো বুঝতে পারবো, যে কী কষ্ট নিয়ে আমাদের পরিবারের সবাই চলে গেছে।

শেখ রেহানা : সেই মুহূর্তটা আব্বা, মায়ের কী মনে হয়েছিলো। কত বড় অভিমান কতবড় কষ্ট নিয়ে কীভাবে যে চলে গেলেন কিছুই জানতে পারলাম না। আর একদিন যখন জন্ম হয়েছে মৃত্যুতো হবেই। মৃত্যুটা যে কোনো জায়গায় যে কোনোভাবেই হয়ে যেতে পারে এবং বাস্তব এটা। আমার তো মনে হয় কেন আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখলেন, আমার তো যাওয়ার কথাই ছিলো না। আপা তো দুলাভাই ওখানে সুতরাং সে যাবে। খালি বলতাম যে, কী কারণে কী উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকলাম, হয়তো একটু দোয়াদরুদ পড়ার জন্য অথবা এই বাড়িতে থাকার জন্য। এই প্রশ্নের উত্তরতো কখনও আমরা পাবো না, কেন বেঁচে আছি।

তারানা হালিম : কখনও কি আপনাদের মনে হয় যে এই দুঃখটা বহন করতে করতে আপনারা অনেক সহনশীল হয়ে গেছেন। আপনাদের ভেতরটা অনেক শক্ত হয়ে গেছে, যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি বা পরিবেশে মোটামুটি টিকে যাবার মতো একটা মনোবল তৈরি হয়ে গেছে?

শেখ রেহানা : ভয় জিনিসটা নাই। ভয় করলে ভয়, না করলে নয়। ভয় করবো কেন! যেভাবে সব নিরীহ মানুষগুলোকে এভাবে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাদের কোনো কাজ যদি আমরা করে যেতে পারি। আর যেটা হবে হবেই, এটা বোধহয় খোদাতালার উপর থেকে রহমত হয়ে যায়। তা নাহলে আমাদের আজ এখানে সুস্থ হয়ে বসে কথা বলার নয়। আমাদের তো পাগল হয়ে রাস্তায় বের হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। ঐ একটাই শুকর করি যে, আল্লাহ তুমি পাগল করে রাস্তায় বের করে দেও নাই। অন্তত সুস্থ রেখেছ, কিছু বলতে পারছি, মানুষ জানতে পারছে, না হলে মিথ্যা প্রচার করতে করতে মিথ্যাকে সত্য করে দাঁড় করিয়ে দিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা, বঙ্গবন্ধুর কথা তো মুছে ফেলার ব্যবস্থাই হয়ে গিয়েছিলো। সেজন্য মনে করি যে, এই জন্যই মনে হয় বেঁচে ছিলাম। আপা এত কিছু ত্যাগ স্বীকার করে কোথায় সংসার, কোথায় বাচ্চা সবকিছু ফেলে রেখে দেশের কাজে, এ জন্যই বোধহয় আল্লাহ আমাদেরকে রেখে গেছেন। খোদাতালার রহমত আমাদের উপর যে, এখনও মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে চলে যাচ্ছি। ভেতরটা যে কী হয়ে যাচ্ছে– হাসি, খাই, দুনিয়া যেভাবে চলে, চলে যাচ্ছি। কিন্তু ভিতরটা যে কীভাবে ছিঁড়ে ফুঁড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা কাউকে বলতে পারি না। কেউ এ উপলব্ধিটা করতে পারবে না।

শেখ হাসিনা: এটা ঠিক যে, আসলেই আঘাত পেয়ে পেয়ে মনটা এমন হয়ে গেছে যে, ১৫ই আগস্টের আঘাতের পর এর থেকে যে আর বড় কোনো আঘাত আছে বা আর কোনো বড় আঘাত আসতে পারে বা থাকতে পারে সেটা মনে করি না, সেটা মনে হয় না।

দ্বিতীয় কথা হলো, অবশ্যই ধৈর্য তো হয়েছেই। কারণ ওতো সবার ছোট, ওর আবদারের সীমা ছিলো না। ওর তো এতটুকু ধৈর্য ছিলো না, ওর তো সবার কাছে আবদার। আমার কাছে আবদার, কামালের কাছে, জামালের কাছে, আবদার মা, আব্বা– ওতো আমাদের ছোট বলে ওর কথা আলাদা। আর সেই ছোট্ট রেহানা আজকে জীবনের সাথে যুদ্ধ করে ১৫ই আগস্টের পরে নিজের জীবনকে গড়ে তোলা

নিজের জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে টিকে থাকা, এই আঘাতের পর একটা ধৈর্য-শৈর্য এবং সব কিছু সহ্য করার একটা ক্ষমতা এটা আসলে আল্লাহর তরফ থেকে এসে যায়। আসলে আঘাত মানুষকে সহ্য করার শক্তি দেয়। নইলে আমি বাড়ির বড় মেয়ে আমি আমি তো কখনও এত ধৈর্য দেখাবো এটা তো ছিল না। আমার আব্বা জেলে থাকতেন এটা ঠিক। কিন্তু যতটুকু সময় উনি থাকতেন যতটুকু সময় আমরা কাছে পেতাম ওনার আদর স্নেহ ভালোবাসায় সবকিছু ভরিয়ে দিতেন এবং আমাদের বাড়ির পরিবেশটা এত সুন্দর ছিল এত চমৎকার ছিলো শত দুঃখে শত কষ্টে শত আঘাতে সব কিছু সয়ে নেবার মতো, সবকিছু মোকাবেলা করার মতো একটা যেন মানসিকতা আমার বাবা-মা-ই আমাদেরকে গড়ে তুলে দিয়ে গেছেন। কারণ আঘাত তো আমাদের উপরে বার বার এসেছে বা আব্বা রাজনীতি করছেন, কতবার আঘাত এসেছে, কতবার জেলে যেতে হয়েছে। এতটুকু হতাশা বা ভেঙে পড়া কখনও দেখি নাই। সবকিছুতেই সামলে নেয়া মোকাবেলা করে এগিয়ে যাওয়া এই জিনিসটা ছিলো। এমনকি আমার দাদা-দাদি, তাদের মাঝেও এত বয়স হয়ে গেছে, এই যে আব্বা জেলে কত কষ্ট করছেন। '৭১ সালে আমার দাদা-দাদিকে বসিয়ে রেখে চোখের সামনে দাদার সেই পুরানো বাড়ি পুড়িয়ে দিলো, তার পর তাদেরকে ছেড়ে দিলো। রাস্তায় পড়ে আছেন, কিছু নাই, বাড়ি ঘর পুড়ে শেষ, কিন্তু ধৈর্যহারা হননি। তার মাঝেও সবকিছু সামলে নেওয়া। আমার দাদা-দাদির কথা ছিলো যে, আমার ছেলেতো কোনো অপরাধ করেনি। দেশের জন্য কাজ করছে, দেশের মানুষের জন্য কাজ করছে। ১৫ই আগস্টের আঘাত তো চরম আঘাত। আমার দাদা-দাদির কপাল ভালো যে তার আগেই তারা চলে গেছে। এই কষ্ট তো তাদের পেতে হয়নি। কিন্তু জানি না কেন আমরা দু'টো বোন মাঝে মাঝে ভাবি যে, আমরা কেন বিদেশে গেলাম? যদি না যেতাম তাহলে আর এই কষ্ট সহ্য করতে হতো না। একসাথে এই বাড়িতে সবাই শেষ হয়ে যেতাম। অনেক ভালো, অনেক ভালো ছিল যে এক সাথে আমরা সবাই শেষ হয়ে যেতে পারতাম। থাকলে তো বাঁচিয়ে রাখতো না। কিন্তু জানি না, সবই আল্লাহর ইচ্ছা, আল্লাহর হয়তো কোনো ইচ্ছা যে, আমাকে দিয়ে বা আমাদের দ্বারা কিছু একটা করা যায়।

তারানা হালিম : আচ্ছা আপা, সব সময় তো সমালোচক আপনাদের ঘিরে থাকে, কেউ যদি এভাবে সমালোচনা করে যে, এই যে আপনজনদের হারানো, আপনার শোক বা বেদনা এটি একটা পলিটিক্যাল স্ট্যান্ট, এটার জবাব দিবেন কীভাবে?

শেখ হাসিনা : আমি তাদের এই বলি যে, আমার মতো কেউ যদি তাদের আপনজন হারায় তাহলে তারা সেই কথাটা উপলব্ধি করে। আমি তো আসলে নিজে যেচে পলিটিক্সে আসিও নাই, চাইও না। পলিটিক্যাল ফ্যামিলিতে জন্মেছিলাম। আমি '৮০ সালে লন্ডনে গেলাম, তখন সেখানে আমার রাজনীতির সঙ্গে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেওয়া, কিন্তু ওখানে তো আমি পার্টির কিছুই ছিলাম না। পার্টির কিছু হবো এ চিন্তাও আমার ছিলো না। বরং আমার অবর্তমানেই আমাকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট করা হলো এবং আমি এসে হাল ধরেছি, কাজ করেছি। আমি কী পাব

না পাব সেটা নিয়ে আমি কখনও চিন্তা করি নাই বা আমি কী হবো সেটাও আমার চিন্তা ছিলো না। আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি যে, আমার বাবা সারাটি জীবন এদেশের মানুষের জন্য এত কষ্ট করে যাচ্ছেন আর সেই মানুষগুলি অবহেলিত। সেই মানুষগুলি দুঃখ পাচ্ছে, কষ্ট পাচ্ছে। একটা অনিয়ম উশৃঙ্খলতা, মানুষের কোনো অধিকার নেই, মানুষের কথা বলার অধিকার নেই, চরমভাবে অবহেলিত একটা জনগোষ্ঠী। স্বাভাবিকভাবে তাদের জন্য কিছু করা, তাদের পাশে দাঁড়ানো, তারা কী চায় সে কথাগুলি তুলে ধরা, তাদের কিছু দেওয়া।

মাঝে মাঝে তো মনে হয় যে, সব কিছু ছেড়ে নিরিবিলি শুধু বাবা মায়ের জন্য দোয়া করি, ভাইদের জন্য দোয়া করি, এভাবেই জীবনটা কাটাই। সব সময় যে এই হৈ চৈ ভালো লাগে তা তো নয়। মাঝে মাঝে তো সবকিছু ছেড়ে একটা নীরব নিস্তব্ধতায় যেতে হয়। যেমন এই যে আজকে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে এটা যে কত কষ্টকর। তারপরও মানুষ জানতে চায়, মানুষ জানুক যে কী ঘটনা ঘটেছে, কী কষ্টের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু পাওয়া বা কিছু করা এ সমালোচনা যারা করে তারা নিষ্ঠুর! আমি বলবো তাদের মতো নিষ্ঠুর আর কেউ না। চরম নিষ্ঠুরতা তারা দেখাচ্ছে। কারণ, এটা বলা অন্যায়, এটা চরম নিষ্ঠুরতা, অমানবিক। কিন্তু যারা এ কথা বলবে তাদের মঝে মনুষ্যত্ববোধ বলতে এতটুকু নেই। বা তারা বিকৃত মানসিকতার। আমাদের যদি সব কিছু নিয়ে আমার বাবা-মা, ছোট্ট রাসেলকে ফিরিয়ে দিলে আমরা কিছু চাই না। আমরা সব দিয়ে দিবো। যারা এই ধরনের সমালোচনা করবে তারা চরম নিষ্ঠুর বলে আমি মনে করি।

শেখ রেহানা : কিন্তু যারা খুন করেছে খুনিরা পুরস্কৃত হয়েছে। তাদের কথা একবারও চিন্তা করে না। আমাদের বেঁচে থাকার আর একটা দিক চিন্তা করি আজকে যে হত্যাকারীদের আমরা ধরতে পেরেছি। সবাইকে না পারলেও ওদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা আপা দেশে না আসলে, রাজনীতিতে না আসলে, ক্ষমতায় না আসলে সম্ভব হতো কিনা, কারণ '৭৫-এর পরের থেকে যতই ছোট ছিলাম লন্ডনে চলে যেয়ে প্রতিবাদ করেছি, সাংবাদিক সম্মেলন করেছি, টাকা নাই পয়সা নাই হেঁটে হেঁটে সব বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে লিফলেট বিলি করেছি। একটা অন্যায় কাজ হয়ে গেছে, একটা হত্যা হয়ে গেছে, এটার বিচার চাই। আজকে এখানে আসার ওটাও আর একটা কারণ যে, বেঁচে বোধহয় এজন্য আছি। এটুকু তো দেখে যেতে পারছি যে খুনিদের এতবড় অন্যায় একটা প্রতিবাদ করে খুনিদের যে একটা বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে পারছি। এটাই আমাদের বেঁচে থাকার একটা সার্থকতা।

তারানা হালিম : আচ্ছা যখন আপনারা দেখলেন পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের অমানবিক নৃশংস হত্যাকা ঘটাবার পর খুনিরা ঘোষণা করলো যে, তারা হত্যাকারী, যেন তারা কোনো অপরাধই করে নি। শিশু হত্যা, নিষ্পাপ নারী হত্যা, স্বাধীনতার স্রষ্টাকে হত্যা, এটা কোনো অপরাধই নয়, এভাবে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সে সময় ভুলে যান আপনি বঙ্গবন্ধুর কন্যা, আপনি ভুলে যান আজকে আপনি প্রধানমন্ত্রী, একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে সে সময় আপনার কী মনে হতো? কতখানি অমানবিক মনে হতো এই বিষয়টিকে?

শেখ হাসিনা : মাঝে মাঝে এটা আমার মনে হয় বা এধরনের সমালোচনারও সম্মুখীন হতে হয়, যেমন আমরা হত্যার বিচার দাবি করেছি। অনেকেই প্রচার করে যে, রাজনীতি করেন শুধু পিতৃ হত্যা বিচার করার জন্য। পাশাপাশি তারা যখন কোন হত্যা করে তার বিচার চায়, তখনি আমার কাছে এ প্রশ্নটা আসে মনে জাগে যে একটা হত্যা হলে এত হৈ চৈ, বিচার চায় সবাই, এত মানবাধিকারের কথা বলে, আর যারা এইরকম ঘৃণ্য অপরাধী তারা কী শুধু একজন রাষ্ট্র প্রধান একজন জাতির পিতা যিনি দেশের স্বাধীনতা এনে দিলেন তাকেই হত্যা করেনি, তারা নারী হত্যাকারী, শিশু হত্যাকারী। মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেকের আছে। সে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়ে সদম্ভে সেটাকে প্রচার করা, সদম্ভে সেটা বলে বেড়ানো যে, হ্যাঁ তারাই হত্যা করেছে। এই যে তারা সদম্ভে বলে বেড়াতো আর তাদেরকেই বিভিন্ন দূতবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হলো। আজকে যখন তাদের বিচার হচ্ছে সেই বিচারের সময় আমরা যখন দেখি যে তাদেরকে বাঁচাবার জন্য, তাদেরকে রক্ষা করার জন্য কোনো কোনো মহল চেষ্টা করছে। এমনকী যেমন একটি রাজনৈতিক দলের একজন এমপি তাদের আইনজীবী হয়ে খুনিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এটা আমি মনে করি, মানবতার প্রতি চরম অবহেলা, চরম অবমাননা করা। এরা কীভাবে খুনিদেরকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়াতে পারে! কীভাবে খুনিদের রক্ষা করতে চায়! যদি সবাই চায় যে, এদেশে হত্যা খুন বন্ধ হোক, তাহলে তো এই হত্যার বিচার সবার আগে হতে হবে। কারণ একটা হত্যার বিচার না হলে হত্যাকারী যদি শাস্তি না পায়, হত্যাকারী যদি পুরস্কৃত হয়, হত্যাকারী যদি সদর্পে ঘুরে বেড়াতে পারে, যদি রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে, তারা যদি একটা দেশের দূত হিসাবে পরিচিত হতে পারে তাহলে তো এদেশে খুন বা হত্যা প্রতিনিয়ত ঘটতেই থাকবে। কে বন্ধ করতে পারবে এদেশের খুন হত্যা? কেউ বন্ধ করতে পারবে না। আমার মনে আছে, একটা ঘটনা বলি, আমরা যখন বিদেশে, আমরা যখন আসতে পারিনি কেউ চিনতো না আমাদের যে আমরা কারা? কিন্তু যেই শুনেছে যে আমরা বাংলাদেশের, সবাই বললেন, ইস আপনারা কী করলেন? আপনারা বাংলাদেশের মানুষ এমন! এমন একটা মানুষকে আপনারা খুন করে ফেললেন! আমি আর রেহানা মানে আমাদের তখনকার অবস্থাটা, আমাদের চোখে পানি অথচ বলতে পারছি না, বললে পারিনি, কী বলবো। এই যে তাদের চোখে যে একটা ঘৃণা তাদের চোখে যে আমাদের দেশের মানুষের প্রতি যে এইরকম একটা মনোভাব। তারপর বললো যে, এই রকম একটা মানুষকে আপনারা খুন করে ফেললেন, আপনারা কী মানুষ? সত্যিই তখন আমরা কিছুই বলতে পারছি না, শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। কারণ আমাদের দু'জনের চোখে তখন পানি এসে গেছে। এটা দেশের জন্য, জাতির জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক যে, খুনিরা এতদিন বলে বেড়াতে পেরেছে, তারা মুক্ত মনে ঘুরে বেড়িয়েছে, এতবড় হত্যাকা

করার পরেও তারা মদদ পেয়েছে, এটা সত্যিই একটা জাতি হিসাবে আমাদের কাছে অত্যন্ত গ্লানির। আজকে তাদের বিচারের রায় বেরিয়েছে। আজকে তাদের বিচার কাজ চলছে, আমার তো আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস যে, ইনশাআল্লাহ বিচারের রায় একদিন বাংলার মাটিতে কার্যকর হবে এবং বাংলাদেশ একদিন অভিশাপ মুক্ত হবে।

তারানা হালিম : আমরা পৃথিবীতে দেখেছি যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান এই অস্ত্রের মুখে ক্ষমতা দখলের কারণে রক্তপাতময় অভ্যুত্থানে কখনো কখনো বলতে পারি নৃশংসতার শিকার হয়েছেন। আপনারা এই মহলের চক্রান্তে সম্পূর্ণ পরিবার হারাবার বেদনার ভার বহন করছেন, এই যে স্বার্থান্বেষী মহলের চক্রান্তে আপনারা স্বজন হারিয়েছেন এবং পৃথিবীব্যাপী এ ধরনের ঘটনা অতীতে ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটতে পারে, এ সব বন্ধের জন্যে জনমত সৃষ্টির কোনো পরিকল্পনা কি আছে আপনার?

শেখ হাসিনা : আমি কিন্তু আমার রাজনীতি শুরু করেছিলাম ঐ জায়গা থেকেই। কারণ ১৯৮০ সালে আমি যখন লন্ডনে যাই তখন নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত শন ম্যাকব্রাইড আয়ারল্যান্ডের যিনি নেতা, তিনিও টমাস উইলিয়ামসহ আরো অনেক ব্রিটিশ এমপিদের নিয়ে আমরা একটা ইনকোয়ারি কমিশন গঠন করি। সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের বা তদন্তের জন্য। যদিও সে কমিশনকে, তখন জেনারেল জিয়া ছিলেন রাষ্ট্রপতি, জিয়া বাংলাদেশে আসতে দেয় নি। কিন্তু তখন থেকেই শন ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে আমার আলোচনা, একটা কথাই আমি বার বার তুলে ধরি যে, এই যে অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা, হত্যা-কু্য ষড়যন্ত্র করা বা রাষ্ট্র প্রধানকে খুন করা বা তার পরিবারকে হত্যা করা এবং তারপর তার ক্ষমতা দখল, এই প্রক্রিয়াটা বন্ধ করা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। তখন আমাদের এই আন্দোলনের লক্ষ্যটাই ছিলো যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। আমরা একটা অল পার্টি পার্লামেন্টেরিয়ান গ্রুপও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গড়ে তুলেছিলাম, যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য। এছাড়া বিশ্বব্যাপী যখন যেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে সেগুলির প্রতিবাদ করা এটাই আমাদের লক্ষ্য। বাংলাদেশে আসার পর থেকে আমার যে আন্দোলন সংগ্রাম, এই সংগ্রামের মূল কথাই হচ্ছে আমরা গণতন্ত্র চাই, ভোটের মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন হবে, কিন্তু হত্যার মধ্য দিয়ে নয়। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে হলে এর কুফল এটা তো সারা দেশে পড়ে, দেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখন আমার এটাই একটা প্রচেষ্টা। আমি যখন জাতিসংঘে ভাষণ দিয়েছি বা বিভিন্ন রাজনৈতিক অঙ্গনে বা পৃথিবীর বিভিন্ন সেমিনারে বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি আমি বিরোধী দলে থাকতেও আমার এই বক্তব্য ছিলো, বিরোধী দলে থাকতেও আমি পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরেছি এবং এই একই বক্তব্য, একই কথা, একই ক্যাম্পেইন আমি বিশ্বব্যাপী করেছি যে, আমরা গণতন্ত্র চাই। এই খুন খারাবির মধ্য দিয়ে সরকার পরিবর্তন, এটা আমরা চাই না।

তারানা হালিম : আপনারা এই যে আজকে বত্রিশ নম্বরে এসেছেন, আমরা কিছুক্ষণ পরেই এখান থেকে হয়তো চলে যাবো। আমরা চলে যাব, কিন্তু আপনারা চলে গিয়েও বোধকরি এখানেই থেকে যাবেন। কারণ আপনাদের সঙ্গে এই বাড়ির যে স্মৃতি, এ বাড়ির মানুষগুলোর স্মৃতি সেগুলো আপনাদের সঙ্গে সর্বক্ষণই রয়ে যায়।

শেখ হাসিনা : এই বাড়ির স্মৃতি আমাদের মধ্যে কখনও মুছে যাবে না। মুছে যেতে পারে না। এই জায়গায় বসে কত কথা মনে হয়, যেমন কামাল, ওর সারা দিন খেলাধুলায় কাটতো। খুব শখ ছিলো খেলাধুলো, গান গাইতো। এখনও মনে হয় যেন আমি কান পেতে শুনতে পাই, কামাল তার ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছে। চমৎকার সেতার বাজাতো। অনেক সময় গভীর রাতে কামালের সেতারের বাজনা শুনতাম। সে বসে বসে আপন মনে সেতার বাজাচ্ছে অথবা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে দরাজ গলায় গান গাইতে গাইতে। আধ্যাত্মিক গানগুলি সে খুব পছন্দ করতো। এই গান গাইতে গাইতে সে চলতো। জামাল আমাদের ছোট ও একটু পাগলাটে ধরনের ছিলো। নিজে হাঁটতে চলতে নাচতো। ও আবার নাচতে খুব পছন্দ করতো। ও কখনও চুপচাপ দাঁড়াতে পারতো না। মনে হতো সবসময় সে নাচছে। আবার খেলনা নিয়ে খেলতো, এত দুষ্টামি করতো জামাল। একবার মনে আছে, রেহানা জামালের উপর খুব ক্ষেপে জামালকে মারতে গেলো। জামাল তাকে দুহাতে কোলে তুলে নিয়ে সবাইকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে, এই দেখ রেহানা আমাকে মারতে আসছে। সোজা কোলে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরালো। ও ছোট্ট বাচ্চাদের মতো খেলতে পছন্দ করতো। এমন কি জয়কে নিয়েও এক জায়গায় বসে বসে গাড়ি টাড়ি নিয়ে সারা দিন খেলাধুলা। আর রাসেল তো আমাদের সবার ছোট। আমাদের বাসার সবাই আমরা খুব বাচ্চাও পছন্দ করতাম। কাজেই রাসেলের আসাটা যেন আমাদের জন্য, সকলের চোখের মণি, সকলের আদরের ধন। আমার এখনও মনে আছে, রাসেল যেদিন প্রথম হাঁটা শিখে, তো সে প্রথম আমার আঙ্গুল ধরে এই বারান্দা দিয়ে হাঁটলো। সারা বাড়িটা হাঁটলো। হেঁটে হেঁটে একসময় সে আঙ্গুলটা ছেড়ে দিয়ে একা একা হাঁটা শুরু করে দিলো। ও খুব সাবধানী ছিলো। এমনিতে বাচ্চারা হাঁটা শিখতে গিয়ে ধপাস করে পড়ে যায়, ও তা করে নি। তার পরে সে যখন সাইকেল চালানো শুরু করলো এই বাউন্ডারিটার ভিতরে, বিশেষ করে এই রাস্তাটার উপরে শক্ত হয়ে বসে সে সাইকেল চালাতো। সারা দিন সাইকেল নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। তার আর একটা শখ ছিলো ঘুম থেকে উঠেই কবুতরকে খাবার দেওয়া। এইরকম ছোটো থাকতেই সে আমার মায়ের কোলে বা আমাদের কোলে বা একটা বুয়া ছিলো ওকে পালতো তার কোলে বসে কবুতরকে খাবার দেবে।

তারানা হালিম : আপনার বাবা-মাকে আপনারই বাবা-মা হিসেবে কিছু বলবেন?

শেখ হাসিনা : আমার বাবা-মায়ের মতো বাবা-মা পৃথিবীতে হয় না। কারণ আমাদের জন্য তাদের স্নেহ ভালোবাসা, বাবা-মায়ের হাতে মারও খেতাম এটাও ঠিক, কিন্তু মায়ের আদর মায়ের স্নেহ মায়ের ভালোবাসা, আমি অনেক সময় ভাত খাবো না বলে আলসেমি করতাম, মা কোলে বসিয়ে নিজের হাতে ভাত

খাওয়াতেন। কত দিন হয়তো সন্ধ্যার সময় ঘুমিয়ে গেলাম, আব্বা এসে মাকে জিজ্ঞেস করতেন ও ভাত খায় নি? তুলে নিয়ে নিজে ভাত মাখিয়ে পাশে বসিয়ে বলতেন, বসে বসে খাও এখন। আসলে আব্বা বাইরে আসলে যতটুকু থাকতেন, আদর স্নেহ দিয়ে আমাদেরকে ভরিয়ে দিতেন। আমার মায়ের তো তুলনাই নাই, শুধু আমরা কেন আত্মীয় স্বজন পরিবারের কারও কোথায় অসুখ বিসুখ সব দায়িত্ব যেন আমার মায়ের। গান শুনতে খুব পছন্দ করতেন, বই পড়তে পছন্দ করতেন, আমার মা খুব উপন্যাস পড়তেন। প্রচুর লেখা পড়া করতেন।

তারানা হালিম : আমরা জাতির জনককে হারিয়েছি, সে বেদনা আমাদের আছে, সেই বেদনার পাশাপাশি এদেশের নাগরিক হিসেবে, তার কন্যা হিসেবে এই যে দুই কন্যার বেদনা সে বেদনা আমরা কিছুটা ভাগ করে নিই। আপনারা যে বাড়িটায় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর করলেন এর পিছনে কী চিন্তা কাজ করেছে?

শেখ হাসিনা : যখন ফিরে এলাম এবং বাড়িটা পেলাম, আসলে এত স্মৃতিতে ভরা এ বাড়ি, আর এখানে সেই রক্তের দাগ। সব কিছু মিলিয়ে এ বাড়িতে বসবাস করা, বা এ বাড়ি ভোগ করা এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। তা ছাড়া আমার বাবাতো ছিলেন বাংলার জনগণের। তিনি তো নিজের জীবনটাই দিয়ে গেছেন বাংলার জনগণের জন্য। কাজেই আমরাও দুই বোন সিদ্ধান্ত নিলাম যে এই বাড়িটা জনগণের জন্যই দান করে দিবো এবং ট্রাস্ট করে এ বাড়িটা আজকে আমরা দান করে দিয়েছি। এখানে মিউজিয়াম হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতি, সেগুলো আমরা রাখবো এবং আমার বাবা-মা, ভাই, কামাল ও জামালের স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, যারা এখানে জীবন দিয়েছে, যেমন শেখ নাসের আমার একমাত্র চাচা, তিনি তো এই বাড়িতে মারা গেছেন, ১৫ই আগস্ট তাকেও হত্যা করা হয়েছে। কামাল ও জামালের যে নব বধূ, জামালের বিয়েতো একমাসও হয় নি। বাচ্চা মেয়েরা বউ হয়ে এসেছে কত স্বপ্ন কত আশা সব শেষ হয়ে গেছে। এই যে এত স্মৃতি, ১৫ আগস্টে যখন এই বাড়ি আক্রমণ করে সেদিন যারা দায়িত্বে ছিলেন, অনেক পুলিশের কর্মকর্তা মারা গেছেন, সিকিউরিটিতে যারা ছিলেন তারাও মারা গেছেন। এত স্মৃতিভরা এই বাড়ি, যেখানে একদিন আমরা সবাই মা-বাবা, ভাই, বোন আনন্দেভরা একটা ভরপুর সংসারে ছিলাম সেখানে দুই বোনের একা এ বাড়িতে থাকা অসহনীয়।

শেখ রেহানা : আমরা দু'বোনে ঠিক করলাম যে আমাদের তো বেঁচে থাকার কথা ছিলো না। এই বাড়িটা শুধু আমাদের স্মৃতিই নয় এটা সমগ্র বাঙালির বাংলার জনগণের স্মৃতি বিজড়িত। সেই বাষট্টির আন্দোলন থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৭১-এর আন্দোলন সব গুলো চিন্তা করলাম। আমরা যে কোনো মুহূর্তেই যে কেউ চলে যেতে পারি, আর এটা তো সাথে নিয়ে যেতে পারবো না। এমন একটা কাজে এটা দিয়ে যেতে চাই, আমাদের নতুন প্রজন্ম সবাই যেনো ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে পারে। এখানে থাকা যে কষ্টকর ব্যাপার। সব কিছু মিলিয়ে মনে করলাম যে, কিছু দিতে পারি নাই। বাবা তো বুকের রক্ত দিয়ে সবার ঋণ

শোধ করে দিয়ে গেছেন। আমাদের জীবনে আর কী দেওয়ার আছে আর কী হারানোর ও আর কী পাওয়ার আছে। এ বাড়িটি যদি দিয়ে দেই, সবাই ইতিহাস জানতে পারবে, সবার বুকে স্মৃতিটা থাকুক। শুধু আমাদের দু'জনের বুকে কেন! সারা বাঙালির মনে যেন এই বাড়িটা থাকে। আমরা তো জানি না সাড়ে তিন হাত মাটি ছুটবে কিনা, সেটাও কেউ বলতে পারে না। কার কী ভাগ্যে থাকে। এটা থাকলে যতদিন বাংলাদেশও পৃথিবী থাকবে ততদিন এ বাড়িও থাকবে ইনশা আল্লাহ্। সবার বুকে যেন এ স্মৃতি নিয়ে সবাই থাকতে পারে। আমাদের সামান্য বাড়িটুকু বাঙালিদেরকে ট্রাস্ট করে দিয়ে গেলাম, যাতে ব্যক্তি মালিকানা না থাকে। সামান্য সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া ঝাটি মারা মারি কাটাকাটি এটা যেন না হয়। এই বাড়িটা সব বাঙালির এটাই মনে করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আমার দাদার বাড়ি টুঙ্গিপাড়া, আমার ফুপাতো ও চাচাতো ভাইবোন সবার মতামত নিয়ে ওটাও দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্মৃতি জাদুঘর হিসাবে ওটাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

শেখ হাসিনা : যে টাকা পয়সা আমরা পেয়েছি সে টাকা পয়সা ট্রাস্ট করে ঐ টাকা থেকে গরীব দুঃখী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য সাহায্য করে যাচ্ছি। কারণ আমরা কিছু ভোগ করতে চাই না, আমাদের জীবনে কোনো কিছুর দরকার নেই।

শেখ রেহানা : অনেক কিছু পেয়েছি, অনেক কিছু হারিয়েছি। রাতে প্রেসিডেন্টের মেয়ে ঘুমিয়ে, সকালে দেখি কিছুই নেই। সর্বস্বান্ত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। সবকিছু দেখা হয়ে গেছে দুনিয়াতে। যতটুকু থাকি সবার দোয়া মানসম্মান নিয়ে বাকী জীবনটায় যেন চলে যেতে পারি, এটুকুই চাওয়া বা কাম্য।

শেখ হাসিনা : আমরা দু'বোন মানুষের দোয়া চাই। আর আমরা মনে করি যে, বাংলার জনগণই আমাদের সব। তাদের কাছে আমাদের শুধু দোয়া চাওয়া আর তাদের জন্য যদি কিছু করে যেতে পারি এটাই আমাদের সার্থকতা। আমরা ব্যক্তিগত জীবনে কোনো কিছু চাই না।

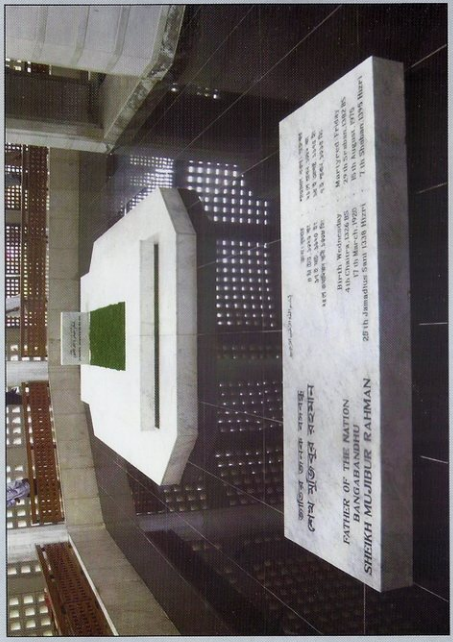

টুঙ্গিপাড়ায় রফিকুর মাজার

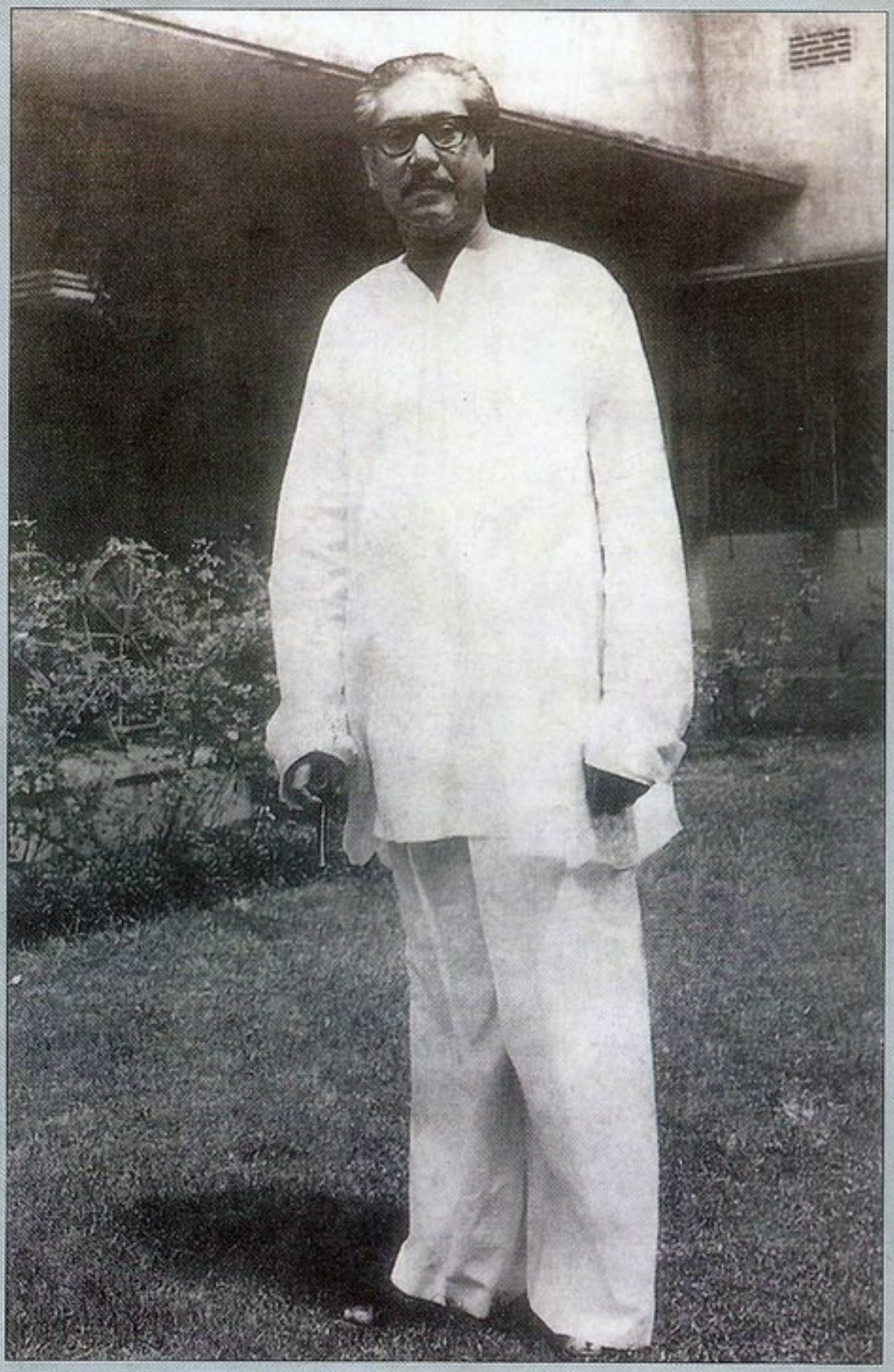

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জন্ম : ৪ চৈত্র ১৩২৬, ১৭ মার্চ ১৯২০ শাহাদৎ বরণ : ২৯ শ্রাবণ ১৩৮২ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫

সম্পাদনায় : শেখ হাসিনা এবং বেবী মওদুদ প্রকাশনায় : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট
প্রথম প্রকাশ : ১৫ আগস্ট ১৯৯৬ • ৭ম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩ • প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জা : মাসুক হেলাল
ফটোগ্রাফ : পাভেল রহমান এবং সংগৃহীত • মূল্য : ৩৫ টাকা